বস্তু-মধ্যস্থ কণাসমূহের দ্বন্দ্ব আর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। যেমন হাইড্রোজেন-এর দুটি অণু আর অক্সিজেন—এর একটি অণু মিলে সৃষ্টি হয় জল। আবার তাপ প্রয়োগে জল হয় বাষ্প। এভাবে কণিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। তবে এজন্য চাই বড়ো রকমের কোনো আঘাত বা বাধা—যার ফলে গতি যাবে বেড়ে; বস্তু পাবে নতুনতর রূপ।

মানব সমাজে এরূপ বাধার নাম বিপ্লব। বিরোধ ও সমন্বয়ে নতুনের উদ্ভব আর নতুন থেকে নবীনতরের উদ্ভব—এরই নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—ডায়লেক্‌টিকাল বস্তুবাদ।

শুধু প্রকৃতি জগতে নয় মানব ইতিহাসেও দেখা যায় এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় আর তার ফলে নতুন যুগের উন্মেষ। তাই এ তত্ত্বের আর এক নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম। গোপাল হালদার এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব দিয়ে মানব-প্রগতি তথা মানব-সংস্কৃতির বিকাশের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বস্তুর সংঘাত-মিলনের সূত্রে উদ্ভূত হয়েছে প্রোটোপ্লাজম—প্রাণপঙ্ক। মানুষের আবির্ভাব এই প্রাণপঙ্কের ক্রমবিকাশের বস্তুনির্ভরতার স্রোতে। আর বস্তুবিকাশের শেষ স্তরে মানব-চেতনার উদ্ভব। এই চেতনা তথা মস্তিষ্ক-বলে মানুষ প্রকৃতির অধীন থাকেনি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে সে। আর বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ, সংগ্রামের পথে বিকশিত হয়েছে তার সংস্কৃতি আর সভ্যতা।

'ইতিহাসের সাক্ষ্য' পরিচ্ছেদটিতে গোপাল হালদার দেখিয়েছেন ইতিহাসে আছে মানুষের এই ক্রমোন্নতির বিবরণ। বার বার এসেছে নানা সংকট আর সেই সংকটের পর মানব-ইতিহাস, মানব-সংস্কৃতি লাভ করেছে নব রূপ।

মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রয়াস থেকে শুরু হয়েছে তার ইতিহাস। কিন্তু তারপর মানব ইতিহাসে শুরু হয়েছে বিরোধ। শোষক আর শোষিতের অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে মানুষের ইতিহাস তাই মানব-ইতিহাস আসলে শ্রেণি-বিভক্ত মানবসমাজের শ্রেণি-বিরোধের বিবরণ।

এর কারণ মানুষ অন্য জীবের মতো প্রকৃতি নির্ভর নয়। দুটি হাত আর মস্তিষ্ক দিয়ে সে পরিবেশকে করে তুলেছে জীবন-উপায়—ইকোলজি হয়েছে ইকনমিক্স। আর এই জীবন-উপায় তথা আর্থিক উন্নতি তার সংস্কৃতির উৎস। জীবনকে উন্নত করার জন্য মানুষ চায় জীবিকার উন্নতি। কিন্তু শোষক শ্রেণি চায় না শোষিতের উন্নতি। ফলে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। একটির অবস্থা উন্নত হলে বেড়ে যায় তার উৎপাদন ক্ষমতা। ফলে অন্যটি চূর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বস্তু-বিশ্বের দ্বন্দ্ব হয়ে যায় উৎপাদন শক্তি ও উপাদানের দ্বন্দ্ব। উৎপাদন করে শোষিত শ্রেণি আর উৎপাদনের উপাদান থাকে শোষক শ্রেণির দখলে। শোষিত শ্রেণি জোর করে কেড়ে নেয় উপাদানের উৎস; দেখা দেয় বিপ্লব। পুরোনো সংস্কৃতি বার বার ভেঙে যায়। কিন্তু বার বারই তার সারবস্তু আয়ত্ত করে নেয় নতুন শ্রেণি। ফলে সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও ঘটে পরিবর্তন।

তাই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণি-বৈষম্য ও তজ্জনিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মানব জাতির ক্রমোৎকর্ষ লাভের ইতিহাস।

সংস্কৃতির ভিত্তি আর্থিক অবস্থা। তবে তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য শক্তি সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এই দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকার পর গোপাল হালদার মূল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। 'সংস্কৃতির তিন অংশ' পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন মানুষের জীবন-সংগ্রামের সার্বিক প্রয়াস, তার বাস্তব ও মানসিক সকল প্রকার 'কৃতি' বা সৃষ্টি নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির মূল অঙ্গ তিনটি—(১) জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমষ্টি (material means), (২) সমাজের বাস্তব গঠন (Social Structure) এবং (৩) মানস-সম্পদ। সবার উপরে এই মানস-সম্পদের অবস্থান বলে তার নাম Superstructure।

সংস্কৃতিকে দেশগত, জাতিগত ও ধর্মগত বলা এবং সাহিত্য, চারুশিল্প, কারুশিল্প, দর্শন-বিজ্ঞানকে সংস্কৃতি সংজ্ঞা দেওয়া—উভয়ই আংশিক সত্য। সংস্কৃতি সমাজ-দেহের সমগ্র রূপ; তাকে সমাজের লাবণ্য বলা যায় না কোনো মতেই।

সমাজের পরিচয়েই সংস্কৃতির পরিচয়। আবার সমাজ-পরিচয় নিহিত তার জীবন-ধারণের উপাদান সমূহের (means of living) উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রস্তর যুগের মানুষের জীবন-প্রয়াস ছিল সমবেত শক্তির মধ্যে নিহিত। কারণ তখন মানুষের জীবন-ধারণের উৎস ছিল পাথরের অস্ত্র দিয়ে পশু শিকার। সমবেত শ্রম ভিন্ন তা সম্ভভব ছিল না। তাই এ সমাজ ছিল সম্মেলক সমাজ।

সংস্কৃতির রূপায়নের প্রথমটিকে তাই বলা যায় জীবন-ধারণের উপকরণ নির্ভরতা। প্রস্তর যুগের মানুষ পারস্পরিক সংযোগ-স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছিল ভাষা। ব্যবহৃত উপকরণকে সুন্দর করে তোলার প্রয়াসও তার ছিল। এই দ্বিবিধ উপকরণ দিয়েই গড়ে উঠেছিল তার সমাজ। জাতিধর্ম নয় মানুষ আর তার জীবনোপকরণ দিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। সেভাবে সমাজের নামকরণ বিজ্ঞানের বিচারে সঠিক নামকরণ।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় অঙ্গ সামাজিক রূপ; তথা ব্যবহৃত উপকরণ দ্বারা সেই সময়ের মানসিক রূপ চিনে নেওয়ার পদ্ধতি। যেমন প্রস্তর যুগের মানুষের মন ক্ষুধা ও ক্ষুধাতৃপ্তির উপায় নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাই এ সমাজে ভাষার ও সৌন্দর্যচর্চার (ব্যবহৃত উপকরণগুলির সৌকর্য সাধনপ্রয়াস) সম্যক বিকাশ হয়নি। এ সমাজ ছিল সমষ্টিগত শ্রমের সমাজ। তাদের মানস-রূপের পরিচয় মেলে সমাধিতে দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে। বোঝা যায় মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধারণা তার মনে দানা বাঁধছিল।

এর পরে এল কৃষিযুগ। তখন নদী, ঋতু, আবহ নিয়ে তার মানস জগৎ গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে এসেছিল জমির মালিকানা সংক্রান্ত চিন্তা। এভাবেই সমষ্টিগত জীবন-সংস্কৃতি ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন সংস্কৃতি। কিন্তু এই মূল স্তরের মধ্যে ছিল জমির মাপ, নদী, মেঘকে তুষ্ট করা ফসল অনিষ্ট রোধ করার জন্য নানা বিদ্যা ও প্রক্রিয়ার চর্চার স্তর।

সংস্কৃতির শেষ অবয়ব মানসসম্পদ। যখন জীবিকা-প্রয়াস কিছুটা সহজ হয়েছে তখনই এসেছে মানসসম্পদের বিকাশের কাল। আদিম স্তরে এই মানসসম্পদের সঙ্গে জীবিকার যোগ ছিল দৃঢ়। তাই পশুপালক জাতির গীতবাদ্য-নৃত্যাদির সঙ্গে মিল ছিল না কৃষিজীবী জাতির গান, নাচ, সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চার। মানস-প্রয়াস তাদের জীবিকা-প্রয়াসকে করেছিল পুষ্ট আর শক্তিমান—তাদের সংস্কৃতি পেয়েছিল পূর্ণতা।

জীবিকা আর সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আছে 'পরস্পরের সম্পর্ক' অধ্যায়ে। গোপাল হালদারের মতে জীবিকা সহজ হয়েছে নতুন নতুন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে। জীবনযাত্রার অগ্রগতির ফলে সমাজ-সম্পর্ক হয়ে উঠেছে নতুন। পরিণতিতে মানসক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন চেতনা আর সৃষ্টি। আবার মানসিক উন্নতির ফলে জাত নতুন চেতনা, নতুন সৃষ্টি—জীবিকার দিকটিকেও পুষ্ট করেছে। এইভাবে বাস্তব ও মানস সৃষ্টি পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিণতিতে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি হয়েছে সমুন্নত, ব্যাপ্ত ও গভীর।

জীবিকার বস্তুনির্ভর উপাদান, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানস সম্পদ—এই তিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি যুগে গড়ে ওঠে সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ। গোপাল হালদার সংস্কৃতিকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে।

মানুষের জীবিকানির্বাহ-পদ্ধতি এ গাছের মূল; সমাজ তার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা আর সাহিত্য, শিল্প, অভিনয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দর্শন, বিজ্ঞান—এই সব মানসসম্পদ এ বৃক্ষের ফুল ও ফল। ফুল-ফল ভিন্ন বৃক্ষ সার্থক নয়; আবার মূল, কাণ্ড ব্যতীত ফল-ফুলের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই তিনের সুষম মিলনেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

সমাজদেহের প্রতি অঙ্গের পারস্পরিক যোগ গভীর ও সক্রিয়। এবং তাদের সম্মিলিত গতিশীল রূপ সংস্কৃতি।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের জয়লাভের অস্ত্র সংস্কৃতি। আবার তার সেই যুদ্ধে জয়ের নিদর্শনও সংস্কৃতি। সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ ও সংজ্ঞা এই সত্যের মধ্যেই নিহিত।

এভাবে গোপাল হালদার তাত্ত্বিক মার্কসবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির; রূপ নির্ণয় করেছেন তার সংজ্ঞা। এই কঠিন কর্মে তিনি সফল যা তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।

১.৭ গোপাল হালদার প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও লক্ষণ

'সংস্কৃতি' বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। 'কালচার' এর মূল উৎস লাতিন 'কুলতুরা' (cultura) শব্দ। লাতিনে শব্দটি এসেছে 'কোল' (col) ধাতু থেকে—যার অর্থ চাষ করা। 'কৃষ্' শব্দটির সাহায্যে সাধারণত মানুষের মার্জিত মানস সম্পদ—সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, চিত্র প্রভৃতি বোঝায়। আমরা মনে করতে পারি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি—যা আছে তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থের 'সংস্কৃতি' অধ্যায়ে (পৃ. ৬)। সংজ্ঞাটি এই "ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি—প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটিই কালচার বা সংস্কৃতি।"

গোপাল হালদার সংস্কৃতিকে কেবলই 'আভ্যন্তর প্রাণ' বা সভ্যতার বাইরের রূপ বলে গ্রহণ করেননি। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সংস্কৃতির বিচার করেছে। ক্রিয়া এবং তার বিপরীত ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব—সব কিছুর মূল—একেই সংক্ষেপে বলা যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া—উভয়ের দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে নতুনের আবির্ভাব। আবার এই নতুনের মধ্যে দেখা দেয় বিরোধ এবং তার সাময়িক বিনাশও ঘটে। দেখা দেয় নতুনতর রূপ। অবিচ্ছিন্ন চলে এই প্রক্রিয়া। এরই নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা 'ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্'। যখন ইতিহাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তখন তা হয় হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

গোপাল হালদার সংস্কৃতিকে মানস-বিলাস বলেননি। তাঁর মতে সংস্কৃতি মনের সৃষ্টিসম্পদ মাত্র নয়; তার উদ্ভব বস্তুজগতের প্রয়োজনে। মানুষ টিকে থাকার সংগ্রামে শক্তি পায় সংস্কৃতি থেকে, আবার জীবনের উৎসও সংস্কৃতি। জীবনযাত্রার সংঘাতে-আঘাতে সংস্কৃতির বাইরের রূপ ও অন্তরের ভাব পালটে যায়। জীবনযাপনের সহায়ক বলেই জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে সংস্কৃতিরও হয় মানোন্নয়ন।

তাঁর মতে মানুষের সংস্কৃতি আছে অন্য কোনো জীবের নেই। কারণ মানুষ জীবিকার জন্য, জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। সে 'জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। মূলত তাহা প্রধান বস্তু, কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি থাকে।'

এই সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যায় বিশদ করেছেন লেখক। প্রথমে তিনি জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে সংস্কৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

বেঁচে থাকার, টিকে থাকার প্রয়াস জীব মাত্রেরই মৌল প্রেরণা। অন্য সব জীব প্রকৃতির নিয়মের অধীন থেকেই জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে নেয়। মানুষ তার দুটি হাতের ব্যবহার এবং মস্তিষ্কের শক্তিতে শক্তিমান। এই দুই শক্তির সহায়তায় সে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করে তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অতএব সংস্কৃতির অর্থ মানুষের কাজ বা কৃতি।

দেহ আর মনের মিলিত শ্রমে মানুষ জীবিকা আয়ত্ত করে এবং ক্রমে তাকে সহজ করে নিতে চায়। এই শ্রমের শক্তি মানুষকে অন্য জীবের থেকে পৃথক করেছে। আবার এই শক্তিই তার সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই মানুষ একই সঙ্গে প্রকৃতির অধীন অথচ প্রকৃতি-নিরপেক্ষ। প্রকৃতির সহায়তায় মানবের এই স্বাধীনতার সাধনাই তার সংস্কৃতি। মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তার স্ব-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার নিদর্শন।

প্রকৃতির সঙ্গে তার এই সংগ্রাম শেষ হয়নি। তা এখনও চলেছে। কেবল সময়ভেদে তার সংগ্রামের উপকরণ আর জয়ের চিহ্ন গেছে পালটে।

সংস্কৃতির এই চলমানতার ব্যাখ্যা করেছেন গোপাল হালদার বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে। সংস্কৃতি যে স্থাণু নয়, তা যে বিকাশশীল বাস্তব জীবন প্রয়াস—বিজ্ঞানের সত্য তার প্রমাণ।

বিজ্ঞান মতে বস্তুই বিশ্বের মূল। এই বস্তু সতত গতিমান—জড় নয়। বিশ্বের তাবৎ বস্তু গঠিত অ্যাটম-এর বিন্যাসগত রূপ হিসেবে। অ্যাটম-এর মধ্যে থাকে প্রোটন-এর চারপাশে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন সমূহ। এছাড়া নিউট্রন পজিট্রন প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চলনশীল কণাও অ্যাটম-এর মধ্যে বিদ্যমান—বিজ্ঞানই সে কথা বলেছে। এইসব কণার মধ্যে আছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি—ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া। এই সংঘাত-মিলনের চক্রপথে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। যেমন জল—দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন কণার মিলনে সৃষ্টি হয় জল। তার মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-এর কোনো গুণই লক্ষিত হয় না। তা সম্পূর্ণ একটি নতুন বস্তু। আবার তাপ প্রয়োগে জল হয় বাষ্প—নতুন আর এক বস্তু। অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগে বস্তুর রূপ যায় পালটে।

মানব সমাজেও বর্তমান এই গতি। সেই গতির মধ্যে আছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ; এই গতির পরিবর্তন ঘটায় বিপ্লব রূপ বাধা বা চাপ। উদ্ভব হয় নতুন গতি আর নতুন সংস্কৃতির।

বস্তুর সংঘাত-সূত্রে এসেছে আদিম প্রাণপঙ্ক-প্রোটোপ্লাজম। বস্তুর দ্বন্দ্বমূলক গতির সূত্রে প্রাণপঙ্ক থেকে একাকোষী প্রাণীর আবির্ভাব। একইভাবে সেই এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব—যার শ্রেষ্ঠ রূপ মানুষ। মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধির শক্তি মানুষকে করেছে উন্নত। প্রকৃতির কাছ থেকে সে ছিনিয়ে নিয়েছে জীবনকে টিকিয়ে রাখার উপকরণ (means)। এভাবেই প্রকৃতি-জয়ের পথে এগিয়ে গেছে মানুষ। প্রকৃতি-বিজয়ের পথেই এসেছে তার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির মূল তাই জীবিকা-প্রয়াস। জীবিকা-প্রয়াসকে মানুষ ক্রমাগত সহজ করতে চায়। ফলে পরিবর্তিত হয় তার অর্থনীতি।

ইতিহাসের দিক দিয়েও গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিচার করেছেন। জীবিকা-প্রচেষ্টার অর্থ উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাত-সমন্বয়ের মাধ্যমে মানব সমাজের ক্রমিক অগ্রগতির বিবরণ।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শ্রম আর উৎপাদন-উপকরণ। একেবারে সূচনায় দুটির মধ্যে অধিকারী-ভেদ ছিল না। কিন্তু জীবিকা-প্রয়াস যত উন্নত হল ততই তার মধ্যে এল উৎপাদন-শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্কজনিত ভেদ। সৃষ্টি হল

শ্রমিক শ্রেণি আর মালিক শ্রেণি—উৎপাদন শক্তি আর উৎপাদন-উপকরণের অধিকারী শ্রেণি। দ্বিতীয় শ্রেণি প্রথম শ্রেণিকে ব্যবহার করে উৎপাদিত বস্তুর অধিকারী হতে চায় আর দ্বিতীয় শ্রেণি চায় উৎপন্নের সম অধিকার। ফলে দেখা দেয় শ্রেণি-বৈষম্য। এই বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় দুই শ্রেণির সংঘাত। সেই সংঘাতের পথে আসে বিপ্লব। উৎপাদন-উপাদান ও উৎপাদন-সম্পর্কের ঘটে পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের ফলে পালটে যায় সমাজ আর সংস্কৃতি।

গোপাল হালদার জীবিকাপ্রয়াস তথা আর্থিক জীবনকে সংস্কৃতির মূল উপকরণ বলেছেন। কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে আর্থিক-বল সংস্কৃতির একমাত্র শক্তি নয়। আর্থিক শক্তির সঙ্গে বস্তুগত ও মানসিক আরও অনেক শক্তির মিলনে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

গোপাল হালদার সংস্কৃতির প্রচলিত সংজ্ঞার আংশিকতার দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সংস্কৃতি বিচারের কোনো স্থির আদর্শ সাধারণত দেখা যায় না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানস-সম্পদকে সংস্কৃতি বলার প্রবণতাই সবচেয়ে প্রবল। তা ছাড়া কাল, ধর্ম আর জাতির ভিত্তিতে সংস্কৃতির বিচারের প্রবণতা লক্ষিত হয় সব দেশেই। তাই বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি, বাঙালির সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতি। এইসব সংজ্ঞায় জনমানসের অহম্ তৃপ্ত হয়।

আবার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, জড়বাদী সংস্কৃতি ইত্যাদি তত্ত্বগত দিক দিয়েও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার প্রবণতা পৃথিবীর সর্বত্রই বেশ প্রবল। এই সব ধারণা ভ্রান্ত নয়। কিন্তু এসব ধারণার ত্রুটি এখানেই যে এগুলি আসলে অর্ধ-সত্য বা অংশ-সত্য। আবার এই ধারণার আংশিকতা অনেক সময়ই সত্য দর্শনের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। জাতিগত সংস্কৃতি-ধারণার বিকৃতি কীভাবে মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তার প্রমাণ হিটলার-এর ইহুদিনিধনব্রত। তাই মানবতার স্বার্থে, মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব জানা প্রয়োজন। সেই তত্ত্ব বলে মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামের বাস্তব ও মানসিক সকল কৃতি বা চেষ্টা নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির উপকরণ : সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তিনটি মূল উপকরণকে নিয়ে; প্রথমত মানুষের জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমূহ (material means), দ্বিতীয়ত সমাজ-ব্যবস্থা (social structure)—যা সংস্কৃতির আশ্রয়, তৃতীয়ত মানস-সম্পদ (super structure)। সংক্ষেপে বলা যায় সমাজ যদি হয় সংস্কৃতির সৌধ তবে মানস-সম্পদ তার শিখর অর্থাৎ উপরিতলের উপকরণ। অতএব সংস্কৃতিকে জাতি, দেশ বা ধর্মনির্ভর মনে করাও যেমন অর্ধ-সত্য তেমন মানস-সম্পদকে সংস্কৃতি বলাও অংশ-সত্য। কারণ সংস্কৃতি সমাজদেহের সমগ্র রূপ, কেবল তার লাবণ্যকে সংস্কৃতি বলা যায় না।

(১) বাস্তব উপকরণ : জীবিকা নির্বাহের উপাদানই (means of living) সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। জীবন যাপনের উপাদান দেয় সমাজের প্রকৃত পরিচয়। যেমন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবন ধারণের উপায় ছিল পাথরের তৈরি হাতিয়ার দিয়ে পশুনিধন। ফলে তাদের সমাজ তথা সংস্কৃতি ছিল যৌথ সংস্কৃতি। কারণ একক প্রয়াসে প্রস্তরাস্ত্র দিয়ে পশুনিধন সম্ভব ছিল না। পরে এসেছে তাম্র আর লৌহ যুগ। কৃষিজীবী হয়েছে মানুষ। ভূমি বা জমি জীবন ধারণের মূল উপাদান হয়ে উঠেছে। ফলে এসেছে জমির মালিকানা সংক্রান্ত চেতনা; এসেছে আবহ, নদীস্রোত প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা। সংস্কৃতির রূপ গেছে পালটে।

আবার প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের উপায় হিসেবে গড়ে তুলেছিল ভাষা। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। কারণ মৃতের সমাধিতে তারা দিত জীবনোপকরণ।

এই সব উপকরণের প্রয়োগ-বিশেষত্বের ভিত্তিতে সেই সব প্রাচীন মানুষের সংস্কৃতির নাম দেওয়া হয়। এভাবেই জীবনোপকরণ হয়ে ওঠে সমাজ-সংস্কৃতির মূল।

(২) সামাজিক গঠন : জীবনোপকরণ দ্বারা যে মানব-সম্পর্ক বিন্যাস গঠিত হয় তাকেই বলা যায় সমাজ। এই

সম্পর্ক বিন্যাসের প্রমাণ হিসেবে বলা যায় প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল অনুন্নত। জীবনোপকরণ তাদের যূথবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল। সে সমাজে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মালিকানা ছিল না। দল বেঁধে সে যুগের মানুষ শিকার করত আর সমবেতভাবে গ্রহণ করত শিকার।

আবার যখন চাষ করতে শিখল মানুষ তখন তার জীবন-ধারণের ভিত্তি হল উৎপন্ন ফসল। তখন মানুষ নদীর স্রোত, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছিল। প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারেনি বলে তাদের চিন্তায় প্রধান হয়ে উঠেছিল প্রকৃতির নানা রূপ থেকে জাত অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বের ধারণা। ফসলের মালিকানার প্রশ্ন থেকে এসেছিল জমির মালিকানার চিন্তা। যৌথ জীবন ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠেছিল ছোটো ছোটো একক যুক্ত সমাজ-বিন্যাস।

এভাবেই উপকরণের প্রয়োগ-ভিন্নতা দ্বারা সংস্কৃতির রূপ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সমাজবিন্যাস হয়ে ওঠে সংস্কৃতির আশ্রয়।

(৩) মানস সম্পদ : যে সব উৎস থেকে আমরা জীবনোপকরণ ও সমাজ-বিন্যাসের আদিম রূপটি জানতে পারি—সে সব উৎস থেকেই সেকালের গান, নাচ, ছবি প্রভৃতি মানস-সম্পদেরও সন্ধান পাই। এইসব মানস-সম্পদের সঙ্গে জড়িত ছিল আচার-অনুষ্ঠান। সেগুলি সর্বত্রই জীবিকা-প্রয়াসের সঙ্গে অন্বিত ছিল। তাই পশু-পালনকারী সমাজের নৃত্য, গীত, চিত্র ছিল পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষিজীবীর গান, নাচ, ছবি, আখ্যানের সঙ্গে যোগ ছিল কর্ষণের। এভাবে তৎকালের জীবিকা-প্রয়াস অর্জন করেছে শক্তি—সংস্কৃতি পেয়েছে পূর্ণতা।

সংস্কৃতির এই তিন উপকরণ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জীবিকা-প্রয়াস নতুন উপকরণ আবিষ্কারের দ্বারা হয়েছে অগ্রগামী। ফলে সমাজকাঠামো হয়েছে উন্নত। উভয়ের সংযোগে মানসিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নব নব চিন্তা-চেতনা আর সৃষ্টি।

মানস ক্ষেত্রের এই সব নতুন চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতি মানুষকে প্রাণিত করেছে সমাজ সম্পর্কের নব বিন্যাসে। এমনইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মনের সৃষ্টি পরস্পরের সহায়ক ও পুষ্টিদায়ক হয়ে উঠেছে। পরিণতিতে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি হয়েছে উন্নত, ব্যাপ্ত, গভীর এবং গতিমান।

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব কাঠামো আর মানস-সম্পদ—এই তিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, সংঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি দেশে প্রতি যুগে সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ গঠিত হয়েছে।

উপমা দিয়ে ব্যাপারটি সহজবোধ্য করেছেন লেখক। তাঁর মতে জীবিকার উৎপাদন প্রথা যেন সংস্কৃতিবৃক্ষের মূল, সমাজদেহ তার কাণ্ড আর শাখা-প্রশাখা, এবং নৃত্য, গীত, সাহিত্য, শিল্প দর্শন, বিজ্ঞান—সেই সংস্কৃতির ফল-ফুল।

আবার সংস্কৃতিকে যদি সৌধ ভাবা যায় তবে জীবনোপকরণ উৎপাদনের পদ্ধতি সেই সৌধের ভিত্তি। সমাজ-সম্বন্ধ এই গৃহের নিম্নতল আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য—এইসব মানস-সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্য-সমৃদ্ধ উপরিতল।

আসলে সমাজ-দেহের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গের আছে গভীর অথচ সক্রিয় সংযোগ। সর্ব অঙ্গের মিলিত রূপই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি কিন্তু স্থাণু নয়, গতিশীল—মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়ে চলেছে আর একই সঙ্গে পরিবর্তিত, গতিময় হয়ে উঠেছে তার সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতি আর মানবজীবনের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও গভীর। কোনোভাবেই তাই সংস্কৃতিকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব বলা যায় না।

১.৮ গঠন শিল্প : সংস্কৃতির সংজ্ঞা

যুক্তির সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ দ্বারা বিষয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষারূপ দান—প্রবন্ধশিল্পের ভিত্তি। গোপাল হালদার ছিলেন মননপ্রধান রচয়িতা। সে কারণে প্রবন্ধ নির্মাণে তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। পাঠবিস্তৃতি সেই নিপুণতাকে দিয়েছিল ব্যাপ্ত গভীরতা। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১ম প্রকাশ ১৯৪১) গ্রন্থের 'সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' শীর্ষক প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সংস্কৃতির গোড়ার কথা' (যা 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' নামে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত) অংশটি গোপাল হালদারের প্রবন্ধ শৈলীর একটি সুন্দর নিদর্শন।

এই প্রবন্ধে গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে। এই তত্ত্বের মূল কথা প্রতি ঘটনা এবং বস্তু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বজনিত ফল। সব ক্রিয়ার থাকে প্রতিক্রিয়া। উভয়ের সংঘাতের পরিণামে উৎপন্ন হয় বস্তু। বিশ্বের সব কিছুর মতো সংস্কৃতিও একটি বস্তু। তা মানুষের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া ও তার উপকরণের প্রতিক্রিয়ায় সঞ্জাত। অর্থাৎ ভাববাদ দিয়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞা সন্ধান করেননি গোপাল হালদার।

তিনি সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন মানব-অস্তিত্বের সূচনা থেকে। প্রোটোপ্লাজম থেকে মানুষের জন্ম। ক্রমে দুই হাত আর মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে শিখেছে মানুষ। ফলে অন্য জীবের মতো জীবিকার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করেনি সে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে সে ছিনিয়ে আনে জীবনধারণের উপকরণ। তার এই জীবিকা-প্রয়াসের সমগ্র রূপেরই নাম সংস্কৃতি—যা স্থির নয়; পরিবর্তনশীল এবং ক্রমোন্নতির পথযাত্রী।

এই জটিল বিষয়টিকে স্পষ্ট বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। বিষয়টিকে তিনি নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান আর ইতিহাসের তথ্য দিয়ে যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক আপন বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এই বিশ্লেষণ কখনও পাঠকমনকে ক্লান্ত করে না—পাঠকচিত্তকে করে তোলে আগ্রহী এবং উৎসুক।

সংযম গোপাল হালদারের এই প্রবন্ধটির বিশেষত্ব। মিতকায় বারোটি প্রথম শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদে তিনি প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বচ্ছভাবে রূপ দিয়েছেন।

সংস্কৃতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কালে তাঁর লেখায় এসেছে শ্রমবিভাজন, শ্রেণি বৈষম্যের বিবরণ। সভ্যতার স্তরানুক্রমিক বিকাশের কথাও গোপাল হালদার বলেছেন।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিচারকালে তিনি প্রাঞ্জলতার প্রয়োজনে কার্লমার্কস (Karl Marx : ১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (Friedrich Engles : ১৮২০-১৮৯৫)—এঁদের রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ ব্যবহার করেছেন। এবং বিবিধ উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে সমর্থ হয়েছেন লেখক।

তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ভার হয়ে ওঠেনি গোপাল হালদারের এই প্রবন্ধটিতে। বরং তার ফলে প্রবন্ধটি হয়েছে আকর্ষক।

এই রচনায় সংস্কৃতির সমগ্র রূপ বিচার করেছেন লেখক সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, প্রধান আশ্রয় এবং মানস সম্পদ—এদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এই তিন উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-নিবিড়তা স্বচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর যুক্তি-বিন্যাসের গুণে।

আরম্ভ, বিকাশ আর সমাপ্তি—এই তিন ভাগে বিন্যস্ত করা যায় তাঁর প্রবন্ধ-আঙ্গিককে। বিষয়টি প্রথমে গোপাল হালদার সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেছেন। তারপরে ব্যাখ্যায় বিস্তৃত হয়েছে তাঁর প্রতিপাদ্য। সমাপ্তিতে তথ্য ও বিশ্লেষণের সুমিত অন্বয় ঘটেছে। ফলে প্রবন্ধটি হয়ে উঠেছে নিটোল এবং সহজ লাবণ্যে সুন্দর।

ভাষা : গোপাল হালদারের এই প্রবন্ধটির ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ভারহীনতা। বিষয়ের গুরুভার তাঁর ভাষাকে কঠিন বা জটিল করেনি। সাবলীল শব্দবিন্যাস তাঁর ভাষাকে করে তুলেছে নমনীয় এবং প্রাণবন্ত।

প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন উদাহরণ। সে সব উদাহরণকে বিষয়কে দিয়েছে স্পষ্টতা। সংস্কৃতির গতিশীলতা বোঝাবার জন্য পরমাণুর গঠন তত্ত্বের ব্যবহার, মানব-সংস্কৃতির অতীত নিদর্শন হিসেবে আলতিমারা ও দর্দঞ-এর গুহাচিত্রের উল্লেখ প্রভৃতির কথা আমরা প্রসঙ্গত মনে করতে পারি।

পরিমিতি তাঁর ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য। ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার, আবশ্যকীয় শব্দ প্রয়োগ—তাঁর ভাষাকে করেছে সংহত।

গোপাল হালদার ব্যবহার করেছেন সাধুরীতির গদ্য। কিন্তু এরূপ বলিষ্ঠতা চলিত গদ্য ভাষায় কমই দেখা যায়। উদাহরণ রূপে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। "... মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়।"

সরল এই গদ্য ভাষা প্রবন্ধটিকে করে তুলেছে মনোগ্রাহী আর আকর্ষক। বিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে ভাষার সুষম অন্বয়ে 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' গোপাল হালদারের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে।

১.৯ প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতি বলতে গোপাল হালদার কী বুঝিয়েছেন? তাঁর প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' প্রবন্ধটির গঠনসৌকর্য ও ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩। গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' কোন ধরনের প্রবন্ধ? সেই প্রবন্ধ-আঙ্গিক ব্যবহারে তিনি কি সফল হয়েছেন? সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। গোপাল হালদার : সংস্কৃতির স্বরূপ দ্রষ্টা—সম্পাদনা সুনীলবিহারী সেনশর্মা, করুণাসিন্ধু দাস, পল্লব সেনগুপ্ত।

২। গোপাল হালদার রচনা সমগ্র (১-২) সম্পাদনা অমিয় ধর।

৩। পরিচয় গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা ১৯৮০।

৪। পরিচয় গোপাল হালদার স্মরণ সংখ্যা ১৯৮৪।

৫। প্রসঙ্গ গোপাল হালদার—অতএব প্রকাশনী ১৯৯২।

৬। মার্কসবাদী সাহিত্যবিচার—ধনঞ্জয় দাস (অখণ্ড)।

একক ২ □ বাংলার রেনেসাঁস

গঠন

২.০ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল ওদুদ

২.১ প্রবন্ধ সংকলন তালিকা

২.২ প্রবন্ধ বিশেষত্ব

২.৩ পাঠ্য প্রবন্ধ : পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

২.৪ বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদের মতামতের বিশ্লেষণ

২.৫ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল গঠনশিল্প

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.০ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল ওদুদ

২.০ সূচনা : কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) :

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে। জন্ম সময় ২ এপ্রিল ১৮৯৪।

ওদুদের পিতা কাজী সগীর উদ্দিন পেশায় ছিলেন রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার। তাঁর প্রকৃতি ছিল রসিক, স্বভাবে ছিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রবণতা। তাঁর কথায় লক্ষিত হত স্পষ্টতা; মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিল দৃঢ়তা। প্রখর ছিল তাঁর আত্মসম্মানবোধ।

তাঁদের পরিবার সম্ভ্রান্ত হলেও তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিল না। তুলনায় তাঁর মাতৃকুল ছিল কিছুটা সচ্ছল।

তাঁর জননীর চরিত্রে ছিল দৃঢ়তা, কর্তৃত্বের ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর বুদ্ধি। বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি হতে পেরেছিলেন পরিবারের প্রধান।

পিতা ও মাতার সূত্রে কাজী আবদুল ওদুদও হয়ে উঠেছিলেন দৃঢ়চরিত্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বলিষ্ঠ চরিত্র, উদারচেতা।

শিক্ষা : কাজী আবদুল ওদুদের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল ফরিদপুর জেলারই জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে। দু বছর পরে তাঁর ছোটো মামা নাজিরউদ্দিন দারোগার চাকরি পাওয়ার পর ওদুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মামার চাকরি বদলির হওয়ায় তাঁকে বার বার স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ঢাকার স্কুল, নরসিংদির শাটির পাড়া হাইস্কুল, রূপগঞ্জের মুরাপাড়া স্কুল—এই তিনটি স্কুলে পড়ার পর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলে তিনি ছিলেন ভালো ছাত্র। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দশ টাকার জেলাবৃত্তি সহ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ.-তে ভর্তি হন। এসময় তিনি বকুলবাগানে এক শিক্ষকের বাসায় থাকতেন। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে; ক্রমে সেই পরিচয়-পরিধি বিস্তৃত হয়। স্নাতক শ্রেণিতে পাঠকালে তিনি বেকার হস্টেল-এ স্থান পান। এখানে তাঁর পরিচয় হয় কয়েকজন সাহিত্যমনস্ক উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে এঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ আফজল হক (ইনি পরে 'মোসলেম

পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রকাশ করেন 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা) ও মুজফ্‌ফর আহমদ। মোহাম্মদ আফজল হকের উদ্যোগে হস্টেল থেকে একটি হাতে লেখা পত্রিকাটি বের হয়। তাতে 'শ্রীদীক্ষিত' ছদ্মনামে রচিত ওদুদের যে লেখাটি স্থান পায় সেটিই তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস।

ওদুদের সঙ্গে যাঁরা পড়তেন তাঁদের মধ্যে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, দিলীপকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। কারণ এঁদের সাহচর্য ওদুদের মনে দেশপ্রীতি ও সাহিত্য-অনুরাগ বিকাশ লাভ করেছিল।

১৯১৭-তে তিনি বি.এ. পাস করেন এবং ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিকাল ইকনমি অ্যান্ড পলিটিকাল ফিলজফি (Political Economy & Political Philosophy Group B) নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আরবি-ফারসি ভিন্ন সংস্কৃতও জানতেন তিনি।

সাহিত্যবোধের সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও দর্শনের সঙ্গে এই পরিচয় ওদুদের প্রাবন্ধিক সত্তাকে করে তুলেছিল যুক্তিনির্ভর আর বলিষ্ঠ—এমত অনুমান করা অসংগত নয়।

কর্মজীবন : রাজনীতিবিদ্যার ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চার সূত্রে তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে লেকচারার পদে যোগ দেন। কুড়ি বছর দক্ষতার সঙ্গে তিনি একাজ করেন। ১৯৪০-এ তিনি বাংলার সরকারি টেকস্‌ট বুক কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এই পদ থেকে তিনি যথাসময়ে অবসর নিয়েছিলেন। এই কাজের সূত্রেই ১৯৪০ থেকে আমৃত্যু তিনি কলকাতায় বাস করেন। কেবল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সময়টুকু তিনি রাজশাহিতে ছিলেন। কারণ তখন সরকারি শিক্ষা দপ্তর রাজশাহিতে চলে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্যচর্চা : সাহিত্য জীবনের সূচনায় কাজী আবদুল ওদুদ প্রবন্ধের সঙ্গে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক—সবই লিখতেন। তবে মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই তিনি খ্যাত এবং পরবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম মুদ্রিত রচনা সমালোচনা-প্রবন্ধ 'বিরাজ বৌ'। শরৎচন্দ্রের উক্ত নামের উপন্যাসের এই সমালোচনাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। যখন তিনি স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র তখনই মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগুচ্ছ 'মীর পরিবার' (১৯১৮) ও উপন্যাস 'নদীবক্ষে' (১৯১৯)। মুসলিম জীবনভিত্তিক গ্রন্থ দুটি সমকালে প্রশংসিত হয়। তাঁর তিনটি গল্প ও একটি নাটিকার সংকলন 'তরুণ' বের হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর লেখা একটি মাত্র একাঙ্ক নাটক 'পথ ও বিপথ' মুদ্রিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। 'জয়তী' পত্রিকায় 'খেলাধূলা' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি রোমা রোলাঁ-এর 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌' উপন্যাসের আদলে। পরে এটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'আজাদ' নামে বের হয়। একই সঙ্গে প্রবন্ধ চর্চাও চলেছিল। তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'সাহিত্যিকের সাধনা' ('মোসলেম ভারত', বৈশাখ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধটির প্রশংসা করেছিলেন ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সবুজপত্র'-এ।

তিনি সম্পাদনা করেছেন 'সংকল্প' (১৩৬১ ব.) এবং 'তরুণপত্র' (১৩৭২ ব. নব পর্যায়) নামে দুটি ক্ষীণায়ু পত্রিকা। এছাড়া 'যুগের আলো', 'অভিযান', 'শিখা', 'নওরোজ', 'জাগরণ', 'সঞ্চয়', 'জয়তী' 'বুলবুল', 'ছায়াবীথি' 'সঞ্চয়' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্ভর প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। সংস্কারমুক্ত চিত্তের অধিকারী কাজী আবদুল ওদুদ যুক্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে।

২.১ প্রবন্ধ সংকলন তালিকা

তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা মোট তেরো। এগুলির মধ্যে জীবনী প্রবন্ধও আছে। তিনি দুই ভাগে কোরআন অনুবাদ করেন। (১) 'পবিত্র কোরআন' ১ম ভাগ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। এবং দুখণ্ডে সংকলন করেন 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) নামে একটি শব্দকোষ।

এখানে তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন ও জীবনী প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া গেল।

(১) 'নবপর্য্যায়' ১ম খণ্ড (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৯২৬), ২য় খণ্ড (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯), দুটি খণ্ডে নানা বিষয়ে ষোলোটি প্রবন্ধ আছে।

(২) 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।

(৩) 'সমাজ ও সাহিত্য' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৪), 'সমাজ' শীর্ষক অংশে আছে আটটি প্রবন্ধ, 'ছিন্নপত্র' নামে তিনটি পত্র-প্রবন্ধ, এবং 'সাহিত্য' শীর্ষক বিভাগে আছে সাতটি প্রবন্ধ।

(৪) 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাম বক্তৃতার (১৯৩৫) গ্রন্থরূপ। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যুক্ত গ্রন্থটি বের হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫)।

(৫) 'আজকার কথা' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৪১) বারোটি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন।

(৬) 'নজরুল-প্রতিভা' (১৯৪৯)—নজরুল বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে আবদুল কাদির রচিত 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি।

(৭) 'স্বাধীনতা দিনের উপহার' (১৯৫১) সংকলনটিতে ছ-টি প্রবন্ধের সঙ্গে একটি কবিতা ('সুভাষচন্দ্র') আছে।

(৮) 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৫১), পূর্বে প্রকাশিত সংকলনগুলির প্রবন্ধের সঙ্গে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে আরও পনেরোটি প্রবন্ধ।

(৯) 'বাংলার রেনেসাঁস'—১৯৫৬-এর জুলাই-এ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ছ-টি বক্তৃতার সংকলন (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৬)।

(১০) 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' (১৯৫৭-এর ডিসেম্বর-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া 'শরৎস্মৃতি' বক্তৃতা-মালার গ্রন্থরূপ, ১৯৬১)। সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে তিনি লিখেছিলেন দুটি গ্রন্থ (১) 'কবিগুরু গ্যেটে' ১ম ও ২য় খণ্ড (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৬) (২) 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' ১ম খণ্ড (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ১৯৬২) ২য় খণ্ড (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৯)।

এছাড়া আছে 'হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামে একটি গ্রন্থ (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৬)। এ গ্রন্থে মোহম্মদ-এর জীবনী ও ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংকলিত হয়েছে।

২.২ প্রবন্ধ বিশেষত্ব

সমকালে আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ বাঙালির চিন্তাজগতে জাগিয়েছিল আলোড়ন। তিনি ছিলেন যুক্তিমনস্ক মননশীল প্রবন্ধ রচয়িতা। তাঁর বিশ্লেষণ ছিল নিরপেক্ষ যদিও তিনি ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ। তাঁর স্বজাতিপ্রীতিও ছিল গভীর। তাঁর কাম্য ছিল বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন অথচ হৃদয়বান মানবসত্তার জাগরণ। মানুষের চেতনা পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ ও দেশকে

ত্রুটিমুক্ত করা ছিল তাঁর স্বপ্ন। সমাজের কোনো অংশকে দূরে রেখে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়—এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন।

মানবতায় গভীর বিশ্বাসী, বুদ্ধির মুক্তিতে আস্থাশীল ওদুদ চাইতেন অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় জাতীয়তার সম্মোহন থেকে বাঙালির মুক্তি।

ধর্ম আর সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত চিন্তাই ছিল তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধের বিষয়। তিনি বুঝেছিলেন বাঙালির উন্নতির সর্বাধিক বাধা প্রচলিত ধর্মের প্রতি অনুরক্তি আর জাতিগত বিদ্বেষ। তাই তাঁর রচনায় ধর্ম বিষয়ক নিয়ম আর হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।

স্বধর্মে গভীর আস্থাশীল হলেও ধর্ম সম্পর্কে কোনো মোহ ছিল না তাঁর। তাই তিনি লিখতে পেরেছেন ধর্মের মোহ বাঙালি মুসলমানের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। 'মহাপুরুষ সর্বজ্ঞ নন মানুষের জীবনে বড় বন্ধু মাত্র'—কাজেই তাঁর কথা বা চিন্তাকে চিরন্তন মনে করা আসলে তাঁর সাধনাকে অপমান করা। এবং এটাই মানুষের বিভ্রান্তির কারণ। একথা বলেছেন তিনি 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে। তিনি আরও বলেছেন 'যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণ ভারের মতনই মানুষের জীবনের উপরে চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুষ্ক ও জীর্ণ হয়ে আসে।' ('সম্মোহিত মুসলমান')

ওদুদের ধর্মনিষ্ঠার প্রমাণ তাঁর আল্লাহ্-এ বিশ্বাস। তবে তাঁর কাছে ''আল্লাহ.....জীবনের এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ।'' তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ এই বিশ্বাসের আলোকেই ভাস্বর।

'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' বক্তৃতামালায় তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের কারণ। যুক্তি দিয়ে এ বিরোধের সমাধানের পথ খুঁজেছেন তিনি। রাজনীতিকে তিনি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি।

সমকালের জাতিবিদ্বেষের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ ওদুদের মতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

'বাংলার রেনেসাঁস' প্রবন্ধে তাঁর চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষণীয়। নবজাগরণের প্রেক্ষিত এবং প্রকৃতি তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে।

ওদুদের সাহিত্যচিন্তার প্রকাশরূপ গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ। তবে পরবর্তী সাহিত্যধারাকেও তিনি অস্বীকার করেননি।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধের ভিত্তি মুক্ত বুদ্ধির প্রকাশ। চিন্তার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেছেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাবিহীন স্বপ্রকাশে উজ্জ্বল মানবতার সন্ধান প্রয়াসেই ওদুদের প্রবন্ধসম্ভার হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট।

২.৩ পাঠ্য প্রবন্ধ : পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

মুক্ত মননের অধিকারী প্রাবন্ধিক কাজী আবদুল ওদুদ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ছ-টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তথ্যনির্ভর, যুক্তিপ্রধান, বিশ্লেষণধর্মী এই বক্তৃতামালার বিষয় ছিল উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। বক্তৃতামালার কোনো শিরোনাম ছিল না। প্রতিটি বক্তৃতা ক্রমানুযায়ী সংখ্যাশীর্ষক-সমেত মুদ্রিত হয় ওই বছরেই।

প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহনের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ।

মধ্যযুগের শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপ-এর ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও আরও কয়েকটি দেশে মানুষের মনে আর জীবনাচরণে দেখা দেয় ব্যাপক এক পরিবর্তন। চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতক বা আরও সংক্ষেপে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলেছিল এই পরিবর্তন। এরই সাধারণ নাম নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। নবজাগরণের তিনটি লক্ষণ (১) পুরোনো জ্ঞানসাধনা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাগ্রহ সচেতনতা, (২) জীবনকে আনন্দ-উৎস হিসেবে গ্রহণ করা; (৩) ধর্ম এবং জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে নতুন চিন্তন।

নবজাগরণের পরিসর ছিল ব্যাপ্ত এবং এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে মধ্য যুগের অন্ধকার অপসৃত করে আধুনিক করে তুলেছিল নবজাগরণ।

উনিশ শতকে বাংলায় হয়েছিল এমনই এক দূরপ্রসারী প্রভাবযুক্ত নবজাগরণ। ধর্ম, সংস্কৃতি সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি—সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের পরিবর্তনের উৎসে কাজ করেছে এই জাগরণ। নবজাগরণের বা রেনেসাঁস-এর সর্বোন্নত প্রকাশ বিশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশি আন্দোলন। তারপরে সন্ত্রাসবাদ, শাসকশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজাত পরিস্থিতি রেনেসাঁস-এর সুফলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বাংলায় নবজাগরণের সূচনা সম্বন্ধে আছে মতভেদ। পরলোক থেকে যখন মানুষ ইহলোকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল তখনই রেনেসাঁস-এর সূচনা, এ ধারণা বশে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে নবজাগরণের উদ্গাতা মনে করেন অনেক মনীষী। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের মানবিকতার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার প্রভাবই প্রবল। তা ভিন্ন এরূপ মানবিকতা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায়। রামপ্রসাদের জীবনবোধ এবং সাধনা ছিল আসলে মধ্যযুগের এবং জীবনবিমুখ। বাংলার রেনেসাঁস একান্তভাবে জীবনমুখী।

বাংলায় ইংরেজশাসন ও যন্ত্রযুগের শুরুকে রেনেসাঁস-এর উৎস বলা যায় না। কারণ ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইংরেজশাসন ও যন্ত্রযুগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু রেনেসাঁস সে সব স্থানে সংঘটিত হয়নি।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনও রেনেসাঁস শুরু হওয়ার কারণ নয়। কারণ এ কলেজ তৈরি হয় ব্রিটিশ শাসকদের এদেশের ভাষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বাংলা গদ্যের সূচনায় এ কলেজের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও বাংলা সাহিত্যকে তা তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি।

রেনেসাঁস প্রধানত কোনো জাতির চেতনার জাগরণ। বস্তুগত বিকাশ তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র।

বাংলায় রেনেসাঁস-এর সূচনা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) কলকাতায় বাস এবং তাঁর 'বেদান্ত' গ্রন্থ ও তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ থেকে। সময় ছিল ১৮১৫ থেকে ১৮১৬। এর আগে অবশ্য রামমোহনের মূল্যবান আরবি-পারসি ভাষায় রচিত পুস্তিকা 'তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন' ('একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার') মুদ্রিত হয়েছিল। বইটি নিয়ে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ হয়। কিন্তু এটি নিতান্ত সাময়িক ঘটনা। তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ রেনেসাঁস-এর উৎস। কারণ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনে এ গ্রন্থ জাগায় নতুন চেতনা। ভারত এবং বহির্ভারতের মনীষীদের মধ্যে পুরোনো ভারতের পরিচয় বিস্তৃত হয়।

'বেদান্তগ্রন্থ' ধর্ম-সংস্কার ভিত্তিক গ্রন্থ। কিন্তু রামমোহন ধর্ম বলতে বুঝেছিলেন জীবনের উৎকর্ষসাধন—বিধিবিধান-নির্ভরতা বা পরকাল-সর্বস্বতা নয়।

১৭৭২-এর মে মাসে হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ রাধানগর গ্রামে পুরোনো জমিদার পরিবারে রামমোহনের জন্ম। অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভা ও ধর্মপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের রীতি অনুযায়ী আরবি-পারসি ভাষায় তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মূল কোরআন এবং আরবি-পারসি সাহিত্য পাঠের ফলে তিনি

একেশ্বরবাদ, যুক্তিনির্ভরতা এবং উদার মানবতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। পাটনা-প্রত্যাগত রামমোহন আরবি-পারসি ভাষায় রচনা করেন 'মনাজেরাতুল আদিয়ান' ('বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা')। তাঁর প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার-বিরোধী মতে পিতা অসন্তুষ্ট হওয়ায় পনেরো বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং তিব্বত পর্যন্ত যান। তিন বছর পরে প্রত্যাগত তাঁকে পিতা গ্রহণ করেন। এবার রামমোহন কাশী গিয়ে হিন্দু শাস্ত্র চর্চা করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি এবং পিতার মৃত্যুর পর ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি তাঁকে ঐশ্বর্যশালী করে। চাকরিসূত্রে জন ডিগবির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্ব তাঁকে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য এবং সমকালের ইউরোপের রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত করে। ডিগবির দেওয়ান হিসেবে নানা স্থানে বিশেষত রংপুরে কাজ করার সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয় তারই ফল 'তুহফাত' (১৮১১)। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় রামমোহন কলকাতায় আসেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সম্পদ বলে বলীয়ান তিনি কলকাতার পদস্থ সমাজে সহজেই স্থান করে নেন। তারপর একেশ্বরবাদ ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে বন্ধুদের অবহিত করার জন্য তিনি স্থাপন করেন 'আত্মীয়সভা'; মুদ্রিত হয় তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার' ও কয়েকটি উপনিষদ এবং সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ। কলকাতার শিক্ষিত ধনী সমাজে গ্রন্থগুলি আলোড়ন জাগায়।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় তখন কিছু মানুষ হয়ে উঠেছিল উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী। জীবনের প্রধান দায়িত্ব সম্বন্ধে অচেতন এই মানুষগুলি সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল আদর্শ। রামমোহনের শাস্ত্রবিচার ভিত্তিক একেশ্বরবাদ তাদের আঘাত করে। কারণ তিনি বেদান্ত মতে বিচার করে একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা এবং পৌত্তলিকতার হীনতা প্রমাণ করেন। তার সঙ্গে সমকালের ধর্মভিত্তিক আচরণের অসারতাও তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

রামমোহন স্বীয় মতানুবর্তী কয়েকজন বন্ধু লাভ করলেও তাঁর বিরোধীপক্ষ ছিলেন প্রবল। বিরোধীপক্ষের কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামমোহনের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হন। গতানুগতিক চিন্তাধারার বাহক এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে। ভট্টাচার্যের কাছে ধর্ম কেবল বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ এবং মন্ত্রপ্রয়োগে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা। আর রামমোহনের মতে ধর্ম মানুষের নৈতিক বা আত্মিক সমুন্নতির কারণ। মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গেও রামমোহনের শাস্ত্রবিচার হয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রমাণ করতে চান বেদ জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। রামমোহন প্রমাণ করেন বেদে অনেক অব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানীর উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের বেদে অধিকার নেই; অতএব এঁদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ প্রমাণ করে বেদপাঠ ভিন্ন বিশ্বসৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে চিন্তন দ্বারাও বিশ্বকর্তা পরমেশ্বর সম্বন্ধে স্থির ধারণা লাভ করা যায়।

রামমোহনের রচনার সাহিত্যগুণও ছিল। তাঁর ব্যঙ্গ ছিল মার্জিত ও তীক্ষ্ণ।

১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর-এর মধ্যভাগ—এই ষোলো বছর রামমোহন সংস্কারক হিসেবে বহু ধরনের কাজ করেন এবং বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। হিন্দিতেও তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন।

বাঙালিদের ইংরেজি শেখার ভালো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবর্গ। কিন্তু দেশীয় প্রধান ব্যক্তিগণও এব্যাপারে রামমোহনের সংযোগের প্রতিবাদে সরে যেতে চান। রামমোহনের কাম্য ছিল বাঙালিদের জন্য উত্তম একটি ইংরেজি বিদ্যালয়। তাই তিনি সরে আসেন সে উদ্যোগ থেকে। ১৮১৭

খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। রামমোহন আপন অর্থে একটি অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—সেখানে বাংলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থাও ছিল।

রামমোহন ধর্ম সম্পর্কে সর্ব প্রকার সংস্কার মুক্ত ছিলেন। তাই খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ব, জিশুর রক্তমাংস ইত্যাদি দুর্বোধ্য তত্ত্ব থেকে মুক্ত নীতি-উপদেশ নিয়ে তিনি রচনা করেন 'Precepts of Jesus–the guide to Peace and happiness' (১৮২০)। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এর প্রতিবাদে বলেন দুর্বোধ্য তত্ত্বই খ্রিস্টধর্মের বিশেষত্ব। রামমোহন মূল হিব্রু ও গ্রিক বাইবেল থেকে প্রমাণ দিয়ে তাঁদের আপত্তি খণ্ডন করেন।

রামমোহন ধর্মের ব্যাপারে সুনীতি, লোকহিত ইত্যাদিকেই বেশি মূল্য দিতেন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান—তিন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার পর তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল বিশ্বস্রষ্টার চিরন্তন অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ স্বভাবগতভাবে চিন্তা করে; কিন্তু উপাসনা পদ্ধতিতে আছে প্রভেদ। সব ধর্মের মধ্যেই আছে ভ্রান্তি। অবতার, পয়গম্বর ইত্যাদির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং তাঁকে ঈশ্বরের মধ্যবর্তী ভাবা ভুল। মানুষের যথার্থ ধর্ম জগৎ-স্রষ্টা ও পালয়িতার সন্ধান করা এবং নীতি পালন করা। প্রকৃতিই মানুষকে দিতে পারে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সন্ধান।

'তুহফাত'-এ প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রের কথা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র চর্চার সময় রামমোহনের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়। তিনি শাস্ত্রকে প্রামাণ্য রূপে অবলম্ভবন করে ধর্মপথ বা কল্যাণপথের সন্ধান করেন। অনেকে বলেন 'তুহফাত' রচনার সময় পর্যন্ত তাঁর ধর্মমত ছিল শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর। পরে তিনি শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তিবাদ অবলম্বন করেন। কিন্তু ধারণাটি ভুল। কারণ যুক্তি ও শাস্ত্র—উভয়ের সাহায্য গ্রহণের কথা রামমোহন বলেছেন, কখনও তিনি বলেছেন কেবল যুক্তিনির্ভরতার কথা। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্ভরতার কথা তিনি কোনো ধর্মশাস্ত্র আলোচনা কালেই বলেননি। হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা সময়ে শাস্ত্রনির্ভর যুক্তিবাদের কথা বললেও পরে তিনি আবার শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের কথাই বলেছেন; লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্র এবং ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডিড তার প্রমাণ। এই ডিড-এ পরমেশ্বরকে জগতের স্রষ্টা ও পালক হিসেবে স্মরণ, মানুষের মনুষ্যত্ববাচক গুণ সমূহের উৎকর্ষসাধন ও পরস্পরের হিতসাধনের কথা বলা হয়েছে। কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা মধ্যবর্তীর কথা সেখানে নেই।

লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত পত্র দেশের পক্ষে এবং রামমোহনের পক্ষে একটি বড়ো ঘটনা।

উনিশ শতকের সূচনায় ইংরেজ সরকার দেখেছিলেন দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য, জালিয়াতি প্রভৃতি দুর্নীতির আধিক্য শাসনকার্যকে বিঘ্নিত করছে; হিন্দু-মুসলিম কোনো সম্প্রদায়েই নীতিশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ লর্ড মিন্টো তাঁর 'মিনিট'-এ লেখেন এজন্য দরকার দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স এক লক্ষ টাকা দেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন, পুনরুজ্জীবন এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট করেন। ১৮২৩-এ ড. হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson : ১৭৬৬-১৮৬০) এবং কয়েকজন প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদদের নিয়ে গঠিত হয় এ জেনারেল কমিটি অব ইন্সট্রাকশন (A General Committee of Instruction)। এঁদের মন্ত্রণায় লর্ড আমহার্স্ট ঠিক করেন কলকাতায় সংস্কৃত তথা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে একটি কলেজ যেখানে কিছু বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। সংস্কৃতের পরিবর্তে যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় এ মর্মে রামমোহন একটি চিঠি লেখেন লর্ড আমহার্স্টকে। কারণ "....সরকার চাচ্ছেন এদেশের লোকের মানসিক উন্নতি, সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চার সুব্যবস্থা করা ..."। চিঠিটির উত্তর সরকার দেননি। তবে নথিতে এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়—রামমোহন সরকারের উদ্দেশ্য ভুল বুঝেছেন এবং তাঁর মত দেশের লোকমত নয়। পরে অবশ্য সরকার পাশ্চাত্যবিদ্যা শেখানোর দিকেই জোর দেয়।

রামমোহনের শিক্ষানীতিতে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা, ভারতীয় দর্শনের চর্চা এবং মাতৃভাষা চর্চার দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। যদিও বহু আলোচিত উক্ত চিঠিটিতে তিনি পাশ্চাত্যবিদ্যা চর্চার দিকেই জোর দেন। কারণ এদেশের মানুষের ঝোঁক ছিল বাস্তব জ্ঞানহীন পরমার্থ চর্চার দিকে। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের এই ত্রুটি দূর করা। তিনি যখন এ চিঠি লেখেন তখন ইংল্যান্ড-এ বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। এর তেরো বছর পরে সে দেশে কলেজ অফ কেমিস্ট্রি স্থাপিত হয়। সাঁইত্রিশ বছর পরে লন্ডন ইউনিভার্সিটি-তে ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স খোলা হয় আর ছেচল্লিশ বছর পর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ-এ বিজ্ঞান-অধ্যাপনা রীতিমতো শুরু হয়।

এ সময়ে রামমোহনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে আছে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি সংবাদপত্র পরিচালনা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। এ বিষয়ে রামমোহনের আবেদন শাসকপক্ষ উপেক্ষা করে। এর অনেক পরে ১৮৩৫-এ লর্ড মেটকাফ-এর প্রয়াসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

খ্রিস্টীয় শাস্ত্র আলোচনা কালে রামমোহন ব্যাপটিস্ট পাদরি উইলিয়ম অ্যাডাম-কে বন্ধু রূপে পান। ইনি রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার ফলে ত্রি-তত্ত্ব ত্যাগ করে খ্রিস্টীয় একত্বে বিশ্বাসী হন। ফলে এ দেশের খ্রিস্টান সমাজে বিশেষ আলোড়ন জেগেছিল।

অ্যাডাম-এর সহায়তায় রামমোহন স্থাপন করেন একত্ববাদী একটি প্রার্থনা সমাজ। প্রয়াসটি ফলপ্রসূ হয়নি। কয়েকজন বাঙালি বন্ধু মতান্তরে অ্যাডাম-এর সহায়তায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট রামমোহন স্থাপন করেন ব্রাহ্ম সমাজ। এদেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে রামমোহন স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজের মূল্যবান ব্যাপ্ত ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। ক্রমশ ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি হয়। ১৮৩০-এর প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় এবং এ সম্বন্ধে সুখ্যাত 'ট্রাস্ট ডিড অফ দ্য ব্রাহ্ম সমাজ' ('Trust Deed of the Brahma Samaj') রচিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের ক্রমোন্নতি দর্শনে সংস্কার-বিরোধী দল একই বছরে গঠন করে ধর্মসমাজ। সতীদাহ রোধ সংক্রান্ত আইন নাকচ করা এ সমাজ গঠনের অন্যতম কারণ।

সতীদাহ রোধের কথা কোনো কোনো মুসলিম শাসকও ভেবেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাবে ইংরেজ সরকার সতীপ্রথার নৃশংসতা সম্পর্কে সচেতন হন। কতিপয় খ্রিস্টান যাজকও এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ধর্মাচারে আঘাত জনসাধারণকে শাসনবিরোধী করে তুলবে—এ আশঙ্কায় সতীপ্রথার বিপক্ষে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ১৮০৫-এ জজ-পণ্ডিতগণ বলেন সতীপ্রথা আবশ্যিক ধর্মাচার নয় এবং এবিষয়ে বলপ্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। ক্রমে সরকার নিয়ম করেন বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশী তদন্তের পরই সতীদাহ করা যাবে। সতীপ্রথার সমর্থক সনাতনীগণ এরূপ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে দরখাস্ত করে। এই প্রেক্ষিতে রামমোহন রচনা করেন 'সহমরণ বিষয়ক' দুটি প্রস্তাব। পুস্তিকা দুটি রামমোহনের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন।

সহৃদয়তার সঙ্গে রামমোহন এদেশের অবহেলিত অত্যাচারিত মেয়েদের কথা ভেবেছেন এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তা উপস্থাপিত করেছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সতীদাহ অনাবশ্যক—বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ব্রহ্মচর্য।

রামমোহনের পূর্বে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) বলেছিলেন সতীদাহ অবশ্যকর্তব্য নয়। তিনি মত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু করেননি। কাজেই তিনি যে এ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন—এ মত সত্য নয়। ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ রোধ আইন পাস করেন লর্ড বেন্টিক (Lord Willam Cavendish Bentink : ১৭৭৪-১৮০৯)। তার ফলে সতীপ্রথা বন্ধ হয়। অনেকে এজন্য লর্ড বেন্টিককে সতীদাহ বন্ধ করার

কৃতিত্ব দিতে চান। কিন্তু তিনি তাঁর 'মিনিট' (Minute)-এ লিখেছেন জনমত পক্ষে ছিল বলেই তিনি সতীপ্রথা রদ বিষয়ে আইন প্রণয়নে সাহসী হন। জনমত গঠনের পক্ষে যে রামমোহন রায়ের বাংলা ও ইংরেজি রচনার মনুষ্যত্ব ও বিচারবুদ্ধি উদ্দীপক আবেদন কাজ করেছে তা অনস্বীকার্য।

রামমোহন বেন্টিঙ্ককে সতীপ্রথা রহিত সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করেননি। কারণ তিনিও ভেবেছিলেন তাহলে হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবে। তবে আইন পাস হওয়ার পর তিনি বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানান। তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রার অন্যতম কারণ সতীরোধক আইন বহাল রাখার প্রয়াস। কয়েকজন শিক্ষিত ইংরেজ (যথা ড. হোরেস হেম্যান উইলসন) সতী প্রথা বিষয়ে সনাতনীদের পক্ষে ছিলেন। প্রিভি কাউন্সিল সনাতনীদের যুক্তি অগ্রাহ্য করেন এই যুক্তিতে যে সমকালের বহু শ্রেষ্ঠ হিন্দু প্রথাটিকে পাপ মনে করেন।

হিন্দু মেয়েদের দায়াধিকার অর্থাৎ সম্পত্তিতে অধিকার পুরোনো শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও সমাজে অপ্রচলিত ছিল। রামমোহন তা পুনরায় প্রচলনের চেষ্টা করেন।

তিনি যে শৈব বিবাহের সমর্থক ছিলেন তা অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ স্বীকার করে।

রামমোহনের সমকালে দেশে ও বিদেশে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। ১৮১৭-এর ডিসেম্বর-এ 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' ('Calcutta Monthly Journal')-এ মুদ্রিত হয় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোঁসাই রাধামোহন ভট্টাচার্যের মৃত্যুকালে প্রকাশ্যে বেদান্ত ও একমাত্র ব্রহ্মে আস্থা জ্ঞাপনের সংবাদ। এ ছাড়া ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার কাছে নানা ধর্মের পাঁচশো লোকের এক পঙ্‌ক্তিভোজ হয়। সে ভোজসভায় পণ্ডিত গীতা, মুসলমান কোরআন ও পাদরি বাইবেল পড়েছিলেন। ১৮১৬ খিস্টাব্দে আমেরিকা পর্যন্ত রামমোহনের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। অনেকে মনে করেন সে দেশের ট্রানসেনডেন্টিয়ালিজম (Transcendentalism) বা ব্রহ্মবাদের উপর রামমোহনের প্রভাব পড়েছিল।

রামমোহনের কলকাতা আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ-এর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চা। কিন্তু বিবিধ কারণে তা সম্ভব হয়নি। তারপরে তাঁর বড়ো ছেলের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের একটি মোকদ্দমা করা হয়—যার কারণ ছিল রামমোহনের মতবাদের বিরোধিতা করা। কয়েকজন দেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কোনো কোনো পদস্থ ইংরেজ এ ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। দু বছর পরে মোকদ্দমার শেষে রামমোহন-পুত্র নির্দোষ প্রমাণিত হন। এরপর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন ১৮৩০-এর ১৫ নভেম্বর যখন সমুদ্রযাত্রা ছিল হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। রামমোহনের বিলাত যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ রোধ আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিল-এ করা দরখাস্তের বিরোধিতা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেয়াদ শেষে ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় ভারতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। এছাড়া সম্রাটের কাছে দরবার করার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় রামমোহন যাত্রাপথে উত্তমাশা অন্তরীপে ফরাসি জাহাজের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা চিহ্নিত পতাকাকে অভিবাদন করেন। তাঁর স্বাধীনতা প্রিয়তার আর একটি প্রমাণ স্পেন-এর স্বাধীনতালাভে নিজ ব্যয়ে ভোজসভার আয়োজন আর নেপলস-এর পরাধীনতার অবসান না হওয়ায় বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে বেদনা প্রকাশ।

১৮৩১-এর ৮ এপ্রিল রামমোহন বিলাত পৌঁছোন। এখানে তিনি সতীদাহ-সমর্থকদের চেষ্টা বিফল করেন এবং পার্লামেন্ট-এর এক কমিটিকে ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বীয় সুচিন্তিত অভিমত জানান। তাঁর বিলাত গমনের পরোক্ষ ফল—অসাধারণ জ্ঞানী রামমোহনের সংস্পর্শে ইংল্যান্ড-এর সাধারণ মানুষ ও সুধীবৃন্দের মনে অধীন ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধার জাগরণ।

রামমোহন ইংল্যান্ড-এর পার্লামেন্ট কমিটির নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ ও গুণ বিশ্লেষণ করে তার ত্রুটি সংশোধনের পথও নির্দেশ করেন। তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ লাভবান হয়েছে। কারণ তারা

পূর্বে পেত আদায় করা রাজস্বের শতকরা দশ ভাগ, এখন পায় কুড়ি থেকে তিরিশ ভাগ। কিন্তু প্রজার দেয় খাজনা বেড়েছে। সরকারের উচিত প্রজার খাজনা বৃদ্ধি না করার ব্যবস্থা করা। সেজন্য জমিদারদের দেয় রাজস্ব কমানো সংগত। বিলাস-দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সরকার এ ক্ষতি পূরণ করতে পারেন। তিনি দেশের মানুষদের নিয়ে ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের কথাও বলেন।

রামমোহনের এই বক্তব্যের মুদ্রিত রূপ ভারতে পৌঁছোলে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকে বলেন এর ফল ভারতের পক্ষে ভালো হবে। আবার সংস্কারবিরোধী দলের মুখপত্র 'সংবাদচন্দ্রিকা' বলে রামমোহন জমিদারদের দুঃখের দিকটি উপেক্ষা করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধী ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজদের কাগজ 'বেঙ্গাল হরকরা' মন্তব্য করে রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে খাতির করে কথা বলেছেন। কোম্পানির আইনের সুযোগে জমিদারগণ প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চালায় তা আরও স্পষ্ট করে বলাই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত কাজ হত।

রামমোহন কেন কোম্পানির সমালোচনা করেননি তা জানা যায় তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী উইলিয়ম অ্যাডাম-এর বস্টন-এ দেওয়া ১৮৩৮ সালের বক্তৃতা থেকে। তিনি বলেন রামমোহন দেখেছিলেন ইংরেজ-শাসনব্যবস্থায় ত্রুটি সত্ত্বেও আছে কিছু উত্তম গুণ। দেশীয় কোনো শাসন প্রণালীতে তা নেই। তাই তিনি চেয়েছিলেন এ ব্যবস্থার সংস্কার। ভারতের মানুষ ধর্মনীতি আর উন্নত শিক্ষার বিস্তৃতির দ্বারা আরও অধিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগের যোগ্যতা লাভ করুক—এটাই ছিল রামমোহনের কাম্য। তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রিফর্ম বিল পাস না করলে তিনি আমেরিকায় চলে যাবেন। এটি তাঁর গভীর দেশপ্রীতির প্রমাণ। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাধীন হবে।

রামমোহন সাধারণ মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তা দূর করার জন্য তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে অশ্রান্ত প্রয়াসের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা কিন্তু ছিল বিপ্লবী। একটি ভাবধারা বা জীবনধারার অবসানে আসছে নতুন এক যুগ—এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু নবযুগের রূপায়ণের জন্য তিনি খুব কম কাজই করতে পেরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রায়শ সিদ্ধ হয়নি। যেমন ব্রাহ্ম সমাজ-এর ট্রাস্ট ডিড অনুসারে তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সভ্য মার্জিত ব্যক্তিদের ধর্মীয় মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ প্রীতিবশত পরস্পরের মঙ্গালসাধনে যত্নশীল হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দুটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি গৃহ। এক কক্ষে প্রাচীন রীতিতে অব্রাহ্মণের প্রবেশ রোধ করে বেদ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অন্য কক্ষে মূলত হিন্দু শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে গাওয়া হয় কিছু ধর্মসংগীত। অবশ্য এখানে সকল ধর্মের শিক্ষিত ভদ্রজনের প্রবেশাধিকার ছিল।

এই অসাফল্যের কারণ তাঁর যুগান্তকারী ভাবনা ও আদর্শ গ্রহণে দেশের মানুষের অক্ষমতা। তথাপি সম্ভাবনাপূর্ণ চিন্তনের আংশিক রূপায়ণ-সামর্থ্যের জন্যই তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী রামমোহন আপন সন্তানদের তাঁর ধর্মের অনুবর্তী করার চেষ্টা করেননি। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা স্বেচ্ছায় পিতৃধর্ম গ্রহণ করেছিল।

চিন্তানায়কদের দু দলে বিভক্ত করা যায়। একদল চিন্তা ও কাজে প্রভেদ করতে অনিচ্ছুক। অন্য দল পরিচ্ছন্ন সত্যাশ্রয়ী চিন্তা এবং চিন্তার সঙ্গে কর্মের সংগতি সাধনে বিশ্বাসী হলেও কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁদের মত—ভাবনা শুরু হলে কাজও শুরু হবে। রামমোহন ছিলেন শেষোক্ত ধারার চিন্তাবিদ। বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন ভাবনা ছিল তাঁর মনে এবং তা প্রকাশের পথ খুঁজেছিল বিচিত্রভাবে। এটাই একটি ঘটনা; সময় সার্থক করে এ ঘটনাকে।

ইংল্যান্ড-এ রামমোহনের ভারতের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর সম্পর্কে পুর্নবিচারের দাবি বিফল হয়। ছাড়পত্র সংক্রান্ত

জটিলতার জন্য তাঁর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্মভূমি ফ্রান্স দর্শনের বাসনাও সফল হয়নি। এ বিষয়ে ফ্রান্স-এর বিদেশমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান শান্তিকামী নাগরিকদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার হওয়া উচিত অবাধ। পরবর্তী কালের লিগ অফ নেশনস বা ইউ. এন. ও-র মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন তিনি। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর মনে ছিল বিশ্বমানবের মৈত্রীর ভাবনা। এরূপ ভাবনা বহু চিন্তানায়ক পূর্বে করেছেন। তাঁদের ভাবনার সমন্বিত রূপ দেখা যায় রামমোহনের মধ্যে।

বেদান্ত আর সুফিদের অদ্বৈতবাদ এবং জ্ঞান ও প্রেমের সাধনা, ইউরোপীয় মনীষীদের জীবনের বিকাশ তত্ত্ব আর বস্তুনিষ্ঠ সাধনা—এইসব ভাবনা ও সাধনার সমন্বয় দেখা যায় রামমোহনের মধ্যে। বাংলার নবজাগরণের ধারায় রামমোহনের এই বিশিষ্ট সাধনা শক্তি সঞ্চার করেছিল। জাগরণ-ধারার পরবর্তী শক্তিমান সাধকদের সাধনা ও সিদ্ধির তুলনা করলে বোঝা যাবে তাঁর সাধনার বিশেষত্ব।

'বাংলার রেনেসাঁস'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ রামমোহন পরবর্তী বাংলার নবজাগরণের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। এ অংশে আছে ডিরোজিয়ো প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা। প্রসঙ্গত আছে বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ, ব্ল্যাক অ্যাক্টস (Black Acts), বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা আর বাংলার কৃষকদের দুর্দশার কথা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের কথাও বলা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

রামমোহনের জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ জনসমাগমে বিশেষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আগমনে ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ কমে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন—এই দু জনের নেতৃত্বে অতি অল্প সংখ্যক উপাসক ব্রাহ্ম সমাজে আসত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। তারপরই ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা।

রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম সমাজের অবনতির কারণ—তাঁর অনুবর্তীগণের শ্রদ্ধা ছিল রামমোহনের প্রতি; তাঁর নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা তেমন ছিল না। তার উদাহরণ রামমোহন-অনুগামী 'রিফর্মার' ('Reformer') পত্রিকা-পরিচালক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে দেবীপূজা। তৎকালীন সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' তাঁর এ আচরণের সমালোচনা করে। সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আন্দোলন প্রবল হয়। তখন এই সব দুর্বলমনা মানুষ ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করেন। তবে তাঁরা জনহিতকর কাজ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বন্ধ করেননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, টাকির কালীনাথ মুন্সী, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলেনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান—মধ্যবর্তী সময়ে রেনেসাঁস-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (Henry Vivian Derozio : ১৮০৯-১৮৩১)। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইস্ট ইন্ডিয়ান পরিবারের সন্তান ডিরোজিয়ো তৎকালীন কলকাতার শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য-শিক্ষালয় ডেভিড ড্রামন্ড-এর ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্কটল্যান্ড-এর অধিবাসী অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিন্তাধারায় প্রভাবিত ড্রামন্ড প্রাচীন ও প্রচলিত বলেই কোনো কিছুকে মূল্যবান মনে করতেন না। তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন বার্নস (Robert Burns : ১৭৫৯-১৭৯৬)। সাহিত্যপ্রতিভা-সম্পন্ন

নাস্তিক হিসেবে অভিহিত ড্রামন্ড কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ডিরোজিয়ো-প্রতিভার লালন।

১৮২৬-এর শেষে ডিরোজিয়ো হিন্দু কলেজের অ্যাসিস্টান্ট মাস্টার নিযুক্ত হন। তখন তাঁর 'ফকির অফ জাঙ্গিরা' ('Fakir of Jangheera') কাব্য মুদ্রিত ও প্রশংসিত হয়েছে। ডেভিড হেয়ার, রিচার্ডসন (ক্যাপটেন ডি. এল রিচার্ডসন : ১৮০১-১৮৬৫) গ্রান্ট, পার্কার প্রমুখ গুণী ইউরোপীয়দের বন্ধু ছিলেন ডিরোজিয়ো। শীঘ্রই তিনি কলেজের 'মাস্টার অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি' (Master of English Literature and History) পদে উন্নীত হন। দর্শনও তিনি পড়াতেন। মাত্র আঠারো-উনিশ বছরের যুবক ডিরোজিয়োর আশ্চর্য মনন-সমৃদ্ধিই এর কারণ। বায়রন (George Gardon Byron : ১৭৬৮-১৮২৪) প্রভাবিত হলেও প্রকৃত কবি ছিলেন ডিরোজিয়ো। কান্ট (Cante Anguste : ১৭৯৮-১৮৫৭) দর্শন সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সমকালে প্রশংসিত হয়।

জাত-শিক্ষক ডিরোজিয়ো চাইতেন তরুণ ছাত্রদের মন হয়ে উঠুক জিজ্ঞাসু এবং সত্যানুরাগী। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন একটি সনেট। এই সব কারণে তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রদের গড়া অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (সিংহবাবুদের মানিকতলার বাগানে হত এর অধিবেশন)-এর সভাপতি ছিলেন তিনি। এখানে ডিরোজিয়ো-র ছাত্রগণ রচনা পাঠ ও বিতর্ক দ্বারা স্ব স্ব প্রকাশক্ষমতাকে পুষ্ট করে তুলত। সমকালের অনেক মান্য ইংরেজ যোগ দিতেন এ সভায়। তরুণ ছাত্রদের মনে সংস্কারকের উদ্দীপনা জাগিয়েছিল হিউম (David Hume : ১৭১১-১৭৭৪)-এর সংশয়বাদ। তৎকালীন হিন্দুসমাজের তীব্র সমালোচনা করত তারা। আসলে এই যুগটি ছিল সার্বিক সংস্কারের যুগ। ইউরোপ ও কলকাতা তথা বাংলায় তা সমভাবে দেখা দেয়। সংশয়বাদ তাদের প্রচলিত হিন্দুধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় করেছিল; আর যুগ তাদের উদ্‌বোধিত করেছিল নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। তাদের মতে ব্রাহ্মদের সংস্কার প্রয়াস ছিল আংশিক। আসলে দেশকে তারা করতে চেয়েছিল ইউরোপ। এই তরুণদের অস্থিরতা সম্পর্কে অনেকেই প্রকাশ করেছেন অবজ্ঞা। কিন্তু এদের বলিষ্ঠ আন্তরিকতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ইয়ং বেঙ্গলদের প্রাণোচ্ছ্বাস শুধু অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এ প্রবন্ধ পাঠ ও উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়াতেই সীমিত ছিল না; দৈনন্দিন জীবনেও দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরোজিয়োর সঙ্গে গ্রহণ করতেন ইউরোপীয় খাদ্য। ইনি পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত হন। এই তরুণ দল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখলেই উচ্চস্বরে বলত গোমাংস ভোজনের কথা। বিদ্যা ও সত্যানুরাগ প্রশংসিত হলেও এদের পানাহার সম্বন্ধীয় অনাচার, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা হিন্দু সমাজপতিদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে জনৈক গল্পজীবী ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন ঘোষাল কলকাতার বড়ো বড়ো বাবুদের বাড়ি ঘুরে ঘোষণা করে ডিরোজিয়ো ছেলেদের অনাচারী করে তুলেছেন। তাদের বলেছেন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন নেই; ভাইবোনে বিবাহ দূষণীয় নয়। ছেলেরা সাহেবের সঙ্গে খানা খায়। সাহেবের বোনের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ আসন্ন।

শুধু এই রটনাই নয়—হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচরণে তাদের অভিভাবকগণও প্রায়ই অপ্রস্তুত ও সামাজিক ব্যাপারে বিপন্ন হতেন। সমকালের সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছে এরকম বহু সংবাদ। ১৮৩১-এর ১৪ মে-র 'সংবাদ প্রভাকর'-এ মুদ্রিত হয় এক ব্যক্তি পুত্র সহ কালীঘাটে গিয়েছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছেলেটি দেবীকে প্রণামের পরিবর্তে 'গুড মনিং' বলে সম্ভাষণ করায় ক্রুদ্ধ পিতা জানান এই পুত্রের জন্য তাঁকে হতে হয়েছে একঘরে।

১৮৩১-এর ১৬ জুলাই 'সংবাদ প্রভাকর' হিন্দু কলেজের সদস্যদের নিকট অনুরোধ জানায় তাঁরা যেন ছাত্রদের হিন্দু জনোচিত পোশাক পরিধান ও আচার পালনের নির্দেশ দান করেন। এ বছরের মে মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সরকারের শরণ নেয় হিন্দুদের স্বধর্ম পালনে বাধ্য করার জন্য।

সংবাদপত্রে এই সব বিবরণ প্রকাশ ও অনুরোধ প্রার্থনা মুদ্রিত হবার অল্প আগে ১৮৩১-এর ১৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। ডেভিড হেয়ার (David Hare : ১৭৭৫-১৮৪২) আর উইলসন ডিরোজিয়োর শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রশংসা করায় তাঁর বিরুদ্ধে পড়ানোর অযোগ্যতার অভিযোগ টেকে না। তখন প্রশ্ন ওঠে হিন্দু সমাজ কি ডিরোজিয়োর অপসারণ চায়? চারজন হিন্দু সদস্য চান ডিরোজিয়োর অপসারণ। এক জন মাত্র বিরোধিতা করেন। হিন্দু সমাজের মনোভাবের প্রশ্ন ওঠায় ডেভিড ও উইলসন ভোট দেন না। ডিরোজিয়োকে অপসারিত করাই স্থির হয়।

বৃন্দাবন ঘোষালের কুৎসা রটনা ডিরোজিয়ো-র অপসারণের প্রত্যক্ষ কারণ। কেন না উইলসন একটি চিঠিতে বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ জানিয়ে সে সম্বন্ধে ডিরোজিয়ো-র বক্তব্য জানতে চান। প্রশ্নগুলি ছিল এই—(১) ডিরোজিয়ো কি ঈশ্বরবিশ্বাসী? (২) পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য—এই কি ডিরোজিয়োর বিশ্বাস? (৩) ভাইবোনের বিবাহ তিনি পবিত্র মনে করেন কি? (৪) ছাত্রদের তিনি এবিষয়ে শিক্ষা দেন কিনা।

ডিরোজিয়ো প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বিস্তৃতভাবে জানান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না বলেই দার্শনিকদের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা সন্তানের কর্তব্য—একথাই তিনি বলেন। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ছিল 'না'। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে ডিরোজিয়ো বলেন ছাত্রদের তিনি হিউম ও অন্যান্য দার্শনিকদের দর্শন শিক্ষা দেন; তত্ত্ব ও তথ্য বিচারের ক্ষমতা যাতে তাদের মনে জাগ্রত হয় সে চেষ্টা করেন। সচেতনভাবে তিনি তাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হতে শেখাননি।

যথার্থ জ্ঞানানুরাগী হৃদয়বান শিক্ষক ডিরোজিয়ো ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং ছাত্রদের আপন চিন্তনসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা শ্রদ্ধা ও সংকোচহীন দৃঢ়তার সঙ্গে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে বাড়াবাড়ি দেখা দেয় তার কারণ সমকালের হিন্দু সমাজের ধর্মভিত্তিক কপটতা আর নীতিহীনতার আধিক্য। তার সঙ্গে ছিল তরুণোচিত চপলতা। এটাই ছাত্রদের অদ্ভুত আচরণের কারণ—যা ছিল নিতান্তই সাময়িক। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্যক বিচার না করেই ডিরোজিয়ো-র পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডিরোজিয়ো তার পূর্বেই পদত্যাগ করেন। কয়েক মাস পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে হিন্দু ও ইস্ট ইন্ডিয়ান তথা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। ডিরোজিয়ো দেখতেন বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন। তার প্রমাণ বার্নস (Robert Burnes : ১৭৫৯-১৭৯৬)-এর কবিতা থেকে তিনি আপন পত্রে উদ্ধৃত করেন দুটি পঙ্‌ক্তি "... Man to man the world O'er shall brothers be and a that". ডিরোজিয়ো আগে 'পার্থেনন' ('Partheon') নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক সংখ্যা মুদ্রিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বের করতে দেওয়া হয়নি। প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজদের ভারতবাস, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, গভর্নমেন্ট বিচারালয়ে ব্যয়াধিক্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ছিল।

সতীদাহ নিষেধ আইন পাস হওয়ার পর ডিরোজিয়ো দীর্ঘ এক কবিতায় এ আইনের পশ্চাতের উদার অতীত-অপসারী মনোভাবকে অভিনন্দিত করেন।

রামমোহন, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এবং ডিরোজিয়ো—এই ত্রয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পৃথক। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা নতুন ভারতীয় জাতির গঠনের পিছনে এই তিন জনের মনেই ছিল স্বার্থশূন্য সক্রিয় প্রীতি।

ডিরোজিয়োর শিষ্যগণ—যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত তাঁদের জীবনে গুরুর জ্ঞান ও মনুষ্যত্বানুরাগ আশ্চর্য ফল দেয়। তাঁদের দেওয়া অভিনন্দনের (এপ্রিল ১৮৩১) উত্তরে ডেভিড হেয়ার জানিয়েছিলেন দেশ তাঁদের সংস্কারক ও শিক্ষাদাতা হিসেবে দেখতে চায়। ইয়ং বেঙ্গল দল সে আশা পূর্ণ করেন।

ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী—এই নয় জন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) : মাতুলালয়বাসী কৃষ্ণমোহন বন্ধুদের সে বাড়িতে মাংসভক্ষণ ও 'গোমাংস' বলে চিৎকারজনিত কারণে বহিষ্কৃত হন। যদিও তিনি সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। কৃষ্ণমোহন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সে ধর্ম প্রসারে সচেষ্ট হন। তাঁর লেখা 'পারসিকিউটেড' ('Perisecuted') নাটকে ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশন-এর সঙ্গে যুক্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো কৃষ্ণমোহন নির্ভীকতা ও বিদ্যার জন্য দেশবাসীগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) : তরুণ রসিককৃষ্ণ আদালতে সাক্ষ্যদানকালে গঙ্গাজলের পবিত্রতা অস্বীকার করায় পরিজনগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির অধিকারী রসিককৃষ্ণ ছিলেন কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। তিনি রামমোহনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) : ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত রামগোপাল ঘোষ সদুপায়ে ব্যবসা করে ধনী হন। বন্ধুবৎসল ও দানশীল রামগোপাল 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। ইংরেজি আদব-কায়দার অনুরাগী হলেও নীলকর-অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন রামগোপাল। তিনি 'ব্ল্যাক অ্যাক্টস' (১৮৪৯) আইনের ব্যাপারেও উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন।

তখন কলকাতা, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই) ও মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই)-শহরের বাইরে ইউরোপীয়দের বিচার দেশীয় আদালতে হত না। সমকালীন ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 'ব্ল্যাক অ্যাক্টস' নামে অভিহিত আইনে সরকারের অর্থব্যয় কমানোর জন্য প্রস্তাব করা হয় ইউরোপীয়দের বিচার সর্বত্র দেশীয় বিচারকের আদালতে হবে। কেবল প্রাণদণ্ড দেওয়ার অধিকার এ আদালতের থাকবে না।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন সেকালের বিখ্যাত ইংরেজবক্তা জর্জ টমসন। রামগোপাল ঘোষ ও তাঁর বন্ধুরা পেয়েছিলেন এঁর সাহচর্য। নানা ব্যাপারে এর দ্বারা তাঁরা বিশেষ উপকৃত হন। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপনের অন্যতম সহায়ক রামগোপাল ঘোষকে ভারতীয় রাজনীতির পথিকৃৎ মনে করা হয়। তিনি কলকাতার প্রথম বিধবা বিবাহে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)

তেজস্বী ও গণিতবিশেষজ্ঞ রাধানাথ শিকদারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার ও উচ্চতা নির্ণয়। জরিপ বিভাগের কর্মচারী রাধানাথ উপরওয়ালা ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর আর একটি বড়ো কাজ বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে চলিত ভাষায় মেয়েদের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় বলা হয় ধনীমাত্রেই পুণ্যবান নয়। স্বর্গের অধিকার পুণ্যবানেরই আছে। আর সত্য-কথন, নিরভিমানতা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি ত্যাগ, সদ্‌ব্যবহার, পিতামাতার সেবা, পত্নীপ্রীতি, সন্তানদের শিক্ষা ও আচরণের প্রতি দৃষ্টি এবং পরোপকারই পুণ্যবানের লক্ষণ। শাস্ত্রজটিলতা বর্জিত প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের কল্যাণ সাধনে নিবদ্ধমনা ডিরোজিয়ো-পন্থীদের অবলম্বিত এই বিশেষ দৃষ্টির মর্যাদা আজও কম নয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

সুরাপান বিরোধী আন্দোলনের জন্য খ্যাত প্যারীচাঁদ এ ব্যাপারে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যতিক্রম। বাংলা চলিত ভাষাকে তিনি মর্যাদা দান করেন 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে। ফলে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবর্তিত সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা ভাষার মোড় ফিরে যায়।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮)

ঈষৎ চরিত্র-দৌর্বল্যের জন্য সতীর্থদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত দক্ষিণারঞ্জন পরে কর্মদক্ষতার জন্য 'রাজা' উপাধি পান।

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) ও **মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)**—দুজনেই হয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চরিত্রদৃঢ়তা ও সততার জন্য এঁরা খ্যাত ছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮)

নীতিনিষ্ঠ স্নেহকোমল চরিত্রের অধিকারী রামতনু লাহিড়ীর বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে প্রভেদ ছিল না। ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগের বহু পূর্বে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি উপবীত ত্যাগ করে নানা দুর্ভোগ সহ্য করেন। তাঁকে ডিরোজিয়ো ও রামমোহনের সাধনার সেতু বলা হয়।

ডিরোজিয়ো-অনুবর্তী তথা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী রামমোহন-বিরোধী বলেই পরিচিত। কারণ রামমোহন-পন্থীগণ ধর্মবিশ্বাসী ও জাতীয়তাবোধে সমৃদ্ধ আর ইউরোপীয় ভাবাপন্ন ডিরোজিয়ো-অনুবর্তীরা ছিলেন সংশয়বাদী। এ মত প্রকাশ করেছিল ১৮৩২ খিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা খ্রিস্টান অবজারভার' ('Calcutta Christian Observer')। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমকালের শিক্ষিত হিন্দুদের পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়ারার' ইংরেজি সাহিত্যকে অধিক মূল্য দিত। এদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল চিন্তনের অগ্রগামিতা ও উন্নতি)।

কিন্তু ডিরোজিয়ো ও তাঁর শিষ্যদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁদের রামমোহন-বিরোধী বলা যায় না। বরং ডিরোজিয়ো-অনুবর্তীগণ পরে যে উদার মানবিকতা ও দেশহিতৈষণার পরিচয় দেন তা রামমোহন-অনুগামীদের চেয়ে অধিক পরিমাণে রামমোহন-আদর্শের অনুসারী। রামমোহনের অভিপ্রায় ছিল এদেশে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার প্রচার। তা বাস্তবায়িত হয় ডিরোজিয়ো-পন্থীদেরই একনিষ্ঠ প্রয়াসে। অধ্যাপনার ব্যবস্থা সহ উচ্চশ্রেণির স্কুল-কলেজ স্থাপন, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা—এসবই করেছিলেন ডিরোজিয়োপন্থী ইয়ং বেঙ্গলগণ।

প্যারীচাঁদ মিত্র ভিন্ন বাংলা সাহিত্যে ডিরোজিয়োপন্থীরা তেমন কোনো কীর্তির পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁদের গাঢ় অনুরাগ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আসে নতুন যুগ। এ কর্ম সম্ভব করে ডিরোজিয়ো-পন্থীদের অনুবর্তী মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) লেখনী।

এইভাবে সমাজ ও সাহিত্যে—উভয়ত বাংলায় আসে নতুন যুগ।

ডিরোজিয়োপন্থীদের পরে বা তাঁদের যুগের শেষ ভাগে বাংলার নবজাগরণের উদ্যোক্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) সাধনাসৃষ্ট ব্রাহ্ম সমাজ।

রামমোহন ও কিশোর দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সম্পর্ক। তৎকালের অসাধারণ ধনী ও বিলাসী দ্বারকানাথের পুত্র হয়েও তরুণ বয়স থেকেই দেবেন্দ্রনাথের মনে গভীর অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষ লক্ষিত হয়। হয়তো রামমোহনের প্রভাব তার একটি কারণ। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'আত্মচরিত'-এ এই ভগবৎ-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের বিশদ বিবরণ আছে। দ্বারকানাথ অধার্মিক ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ স্বধর্ম ত্যাগ করেননি; কিন্তু ক্রমে তিনি

বুঝলেন প্রচলিত দেবপূজামূলক হিন্দু ধর্ম নয়—রামমোহন প্রবর্তিত ব্রহ্ম উপাসনাভিত্তিক ব্রাহ্ম ধর্মই তাঁর ধর্ম। রামমোহন-শিষ্য ও সহকর্মী রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্ম ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখলেও ক্রমে তা হয়েছিল দুর্বল। তাই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের আলোচনার জন্য ১৮৩৯-এ স্থাপন করেন তত্ত্ববোধিনী সভা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর (১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ) কুড়ি জন বন্ধুর সঙ্গে তিনি রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নিকট ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুগণ বিশেষত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ব্রাহ্ম ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন সত্যনিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে। ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠল ব্রাহ্ম ধর্ম। একালের জীবনজিজ্ঞাসু হিসেবেই তাঁরা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাস্থান নির্ণয়ের প্রয়াসী হয়েছিলেন।

যুবক দেবেন্দ্রনাথের মনে জীবনের যথার্থতার সন্ধানজনিত বেদনা ছিল। হঠাৎ উপনিষদের একটি পৃষ্ঠা থেকে তিনি পান তা থেকে মুক্তির পথ। ইউরোপীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত মানবজীবন প্রকৃতির অধীন—দেবেন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দেয়নি। উপনিষদে তিনি লাভ করলেন এ আশ্বাস—জগৎ পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বের প্রভু ঈশ্বরের শুভ নিয়মে। তিনি এবং সে সময়ের ব্রাহ্মগণ উপনিষদকে গ্রহণ করলেন ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি রূপে। তাই এ ধর্মের অন্য নাম হল বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম। কিন্তু বাধা এল ব্রাহ্ম সমাজ এবং বাইরে থেকে।

উপনিষদ বা বেদান্ত দয়ালু পিতা ঈশ্বরের কথা বলে না, বলে না ঈশ্বর ও জীবের প্রেমবন্ধনের কথা। জীবনের নৈতিক ভিত্তি গঠন বিষয়ে উপনিষদ নীরব। আলেকজান্ডার ডাফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিমান খ্রিস্টধর্ম প্রচারক এ বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সমালোচনা করতে লাগলেন। ডিরোজিয়োপন্থীরা ব্রাহ্ম সমাজকে এ বলে আক্রমণ করলেন যে ব্রাহ্মরা বেদান্তকে অভ্রান্ত ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন না। বেদান্তের দোহাই দিয়ে তাঁরা হতে চান জনপ্রিয়।

এদিকে উপনিষদ তথা বেদ ও বেদান্তের সঙ্গে পরিচয় ব্যাপ্ত ও গভীর হওয়ায় জানা গেল বেদে উপনিষদের একেশ্বরবাদ ভিন্ন আছে বহু ঈশ্বরবাদ, সর্ব ব্রহ্মবাদ (Pantheism)। আরও জানা গেল উপনিষদের সংখ্যা এগারোটি নয়, একশো সাতচল্লিশটি। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন শঙ্করাচার্য যাদের ভাষ্য করেছেন সেই প্রধান এগারোটি উপনিষদেই আছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা ও মুক্তির কথা। পরে উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ায় শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মের মহিমাব্যঞ্জক উপনিষদ রচনা করেন। এভাবে লেখা হয় একশো সাতচল্লিশটি উপনিষদ। আবার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রাণ—ঈশ্বরের সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক বিষয়ে উপনিষদ নীরব। উপনিষদ বলে তিনিই আমি 'সোহমস্মি' তিনিই তুমি 'তত্ত্বমসি'। তখন অক্ষয়কুমার দত্তের পরামর্শে উপনিষদ ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি—এ মত ত্যক্ত হল। পরিবর্তে সিদ্ধান্ত করা হল 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই' ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি। দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন—"সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।"

এই সত্যানুরাগ নবীন ভারতের নবীন প্রাচ্যের, সম্ভবত নবীন বিশ্বের প্রকৃত ধর্ম। কারণ কাপট্যহীন মানব-কল্যাণেচ্ছা ও গভীর অনুভবই সত্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় তথা প্রকৃত ধর্ম। গ্রন্থবিশেষ বা মহাপুরুষের অনুসরণ তার সহায়ক মাত্র। এই শ্রেষ্ঠ সত্য পূর্বেও জগৎ জানত। বাংলার ব্রাহ্ম সমাজই আধুনিক যুগে এই অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ সত্যকে অবলম্বন করেন। এ কারণে বিশ্ব তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সত্য যখন গভীর অনুভবের সঙ্গে অন্বিত হয় ও মহত্তর চেতনার পথে চালিত হয় তখনই তা যথার্থ মূল্য পায়—নতুবা সত্য মূল্যহীন তত্ত্বরূপ অঙ্গার মাত্র। বাংলার ব্রাহ্মদের মধ্যে আধুনিক জীবনের পরম বিত্ত এই সত্যের দীপ্ত রূপ আর অনুভবহীন কৃষ্ণরূপ—উভয়ই লক্ষিত হয়।

ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াস সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। যাঁরা ধর্মাশ্রয়ী যুক্তিবাদকে ধর্ম বিষয়ে রামমোহনের শেষ সিদ্ধান্ত মনে করেন তাঁদের মতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মে এনেছিলেন আমূল পরিবর্তন। তাই তিনিই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি ও লোককল্যাণকে যাঁরা রামমোহনের ধর্মমতের অচ্ছেদ্য

অংশ মনে করেন তাঁদের কাছে দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের সুপরিণতির দিকে অগ্রগমন বলেই গৃহীত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের মতে রামমোহনের অদ্বৈতবাদে আপত্তি ছিল না কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলে দ্বৈতবাদী ভক্ত ও জনকল্যাণকামী আধুনিক মনীষী। তাই তাঁকে বলতে হবে দ্বৈতবাদী জনসেবক গৃহস্থ। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল মানুষের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। ক্লান্তিহীন সাধনাশেষে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মজীবন অর্থে এই সত্যই অনুভব করলেন। তবে তাঁর কাম্য ছিল আত্মার অনন্ত উন্নতি। উনিশ শতকের বাংলার ধর্মসংস্কারের ভিত্তি ছিল শাস্ত্র নয়—বিচারবুদ্ধি। এখানেই ইউরোপীয় রিফরমেশন-এর সঙ্গে তার তফাত। পরে অবশ্য বাংলা ও ভারতে ধর্মচিন্তা প্রাচীন শাস্ত্র-ঐতিহ্যের অনুসরণে সচেষ্ট হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা কেবল ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি নির্ণয়ে বড়ো কাজ করেনি, বাংলা গদ্য তথা বিচারমূলক গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহনের রচনা মূলত প্রাচীন শাস্ত্রকেন্দ্রিক। সে কারণে তাঁর লেখা জনপ্রিয় হয়নি। তত্ত্ববোধিনী সভার যুগে বিচারমূলক গদ্যসাহিত্য সাধারণ জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে মুদ্রিত হয় অক্ষয়কুমার দত্তের সরল ভাষায় গভীর বিজ্ঞান-তথ্যের আলোচনা। জ্ঞানমূলক প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুবাদেও (যেমন বেদ-অনুবাদ) এ সভা সক্রিয় হয়েছিল। বাংলায় উৎকৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের অভাবে ডিরোজিয়ো-পন্থীগণ ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হন এবং তাকে নিজেদের সাহিত্য করে তুলতে চেষ্টা করেন। এঁরা তত্ত্ববোধিনী সভার উৎকৃষ্ট রুচি ও নতুন রচনারীতি দর্শনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশ্বান্বিত হয়ে ওঠেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সদস্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গম্ভীর ও ললিত বাংলা রচনা মধুসূদনের রচনারীতির উৎস—এমন অনুমান করেন অনেক পণ্ডিতজন।

এসময়ে রাজনৈতিক চেতনাও কতকাংশে জাগ্রত হয়। তার প্রমাণ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এর আগে রামমোহন ও 'বেঙ্গল হরকরা' প্রজার অধিকারের কথা বলেছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এইসব চিন্তার মূর্ত রূপ; যদিও এসভা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করে উঠতে পারেনি।

আগেই বলা হয়েছে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১) যোগ ছিল। এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয় তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধ। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাস হয় বিধবাবিবাহ আইন এবং দেশে জাগে আলোড়ন। সতীদাহ নিবারণ আইনের পর এরূপ আন্দোলন আর কোনো ব্যাপারে লক্ষিত হয় না। বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন জন-মনোযোগের কেন্দ্র।

বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট রূপদাতা বিদ্যাসাগর দানশীলতা ও তেজস্বিতার জন্যই পরিচিত। তাঁর মনোগঠন ছিল যুক্তিমূলক। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর যোগ আর সে সময়ে তাঁর রচনায় প্রকাশিত মনোভাব প্রমাণ করে যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর এই যুগের সৃষ্টি। যখন তত্ত্ববোধিনী সভায় ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ আর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে মতভেদ হয় তখন বিদ্যাসাগর অবলম্বন করেছিলেন অক্ষয়কুমারের পক্ষ। এ থেকে প্রমাণিত হয় অক্ষয়কুমারের মতো বিদ্যাসাগরও ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন যুক্তিবাদী ব্যক্তি। ১৮৫০-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কিত একটি নামহীন লেখায় বিদ্যাসাগরের এ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষিত হয়। সেখানে তিনি বলেছেন বাল্যবিবাহ প্রথার মূল স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত কল্পিত পুণ্যলাভ। তবে অবিশ্রাম আলোচনা-আন্দোলনই এসব কুপ্রথা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবে এবং সেগুলি দূর করার চেষ্টা দেখা দেবে। কারণ বিরামহীন সন্ধানেই সত্য প্রকাশিত হয়।

'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব'-এ তিনি লিখেছেন বিধবাবিবাহের ঔচিত্য যুক্তির মাধ্যমে বোঝালে তা এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না। কারণ তারা শাস্ত্রসম্মত কর্মকেই কর্তব্য বলে জানে। তাই প্রথমে চাই বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বিশেষ শ্রম স্বীকার করে তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্র-সম্মতি প্রমাণ করেন। কিন্তু তিনি যেভাবে শাস্ত্রবিচার দ্বারা বিধবাবিবাহের ঔচিত্য প্রমাণ করেছেন তা যুক্তির উপরই নির্ভরশীল। তাঁর যুক্তি—প্রাচীন শাস্ত্রবর্ণিত হিন্দু-জীবনের সঙ্গে একালের হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের মিল নেই। একালের হিন্দু কেবল লোকাচার প্রভাবে বিধবার বিবাহ দানে অসম্মত। অতএব বিধবার বিবাহ দেওয়া কোনো অশাস্ত্রীয় কাজ নয়।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যুক্তিবাদের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছিল পৌরুষের। তিনি ছিলেন ডিরোজিয়ো-যুগের মানুষ। ডিরোজিয়ো-পন্থী অনেকের চরিত্রে দেখা যায় এরূপ যুক্তিবাদ ও পৌরুষের শুভযোগ। তবে আচার-ব্যবহারে তাঁরা ইংরেজিয়ানার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে ছিলেন পুরো বাঙালি।

আসলে সে যুগের যুক্তিবাদ প্রভাবিত করেছিল সকল উল্লেখ্য বাঙালিকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী ইউরোপীয় দর্শনের চর্চা করেছিলেন। তবে যুগোচিত যুক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর চরিত্রে মিশেছিল যুগ-অতিক্রমী ভগবৎ-চেতনা।

এ সময়ের আর এক বিশেষ ঘটনা ১৮৪৯-এ স্যার জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন (Sir John Elliot Drink water Bethune : ১৮০১-১৮৫১ বেথুন নামে পরিচিত) কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের সরকারি রিপোর্ট-এ বাংলার নানা শহরে স্থাপিত উনিশটি বালিকা বিদ্যালয় ও ৪৪০ জন ছাত্রীর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা পূর্বেও কিছুটা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা বেথুন বিদ্যালয়ের প্রাপ্য। কারণ নারীশিক্ষাকে বিদ্যালয়টি দিয়েছিল দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও এ যুগে বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতের অনেক প্রদেশে এসময়েই স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ সময়ের বিশেষ ঘটনা নতুন ধারার বাংলা নাটকের সূচনা।

সমাজের উচ্চ স্তরের এইসব সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল না কৃষক ও মুসলমান সমাজের, এ দুই সমাজেই তখন দেখা দিয়েছিল কিছুটা বিদ্রোহী মনোভাব।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবন উত্তরোত্তর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেও তাদের খাজনা মকুব করা হয়নি। পরের বছরও তাদের খাজনা দিতে হল। অযোধ্যা, বারাণসী, মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের আরও অবনতির মধ্যে ঠেলে দেয়। ইংরেজ কর্তৃক নীল চাষের সূচনায় নীলচাষিদের অবস্থা ঈষৎ উন্নত হলেও শীঘ্রই আরও খারাপ হয়ে যায়। ইংল্যান্ড থেকে বিলেতি সুতোর আমদানির ফলে কাটুনিদের অবস্থারও অবনতি ঘটে।

এদেশে ইউরোপীয় অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে আন্দোলন হয় তদুপলক্ষে লর্ড বেন্টিঙ্ক বলেন এ দেশের পল্লী অঞ্চলে ইউরোপীয়দের বাসের মন্দ ফলই প্রবল। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের এ বিষয়ে মত ছিল ব্যাপারটা চলবে পরীক্ষামূলকভাবে এবং ইউরোপীয়দের দেশে প্রচলিত আইনের অধীন হতে হবে। মেকলে (Macaulay Thomas Babington : ১৮০০-১৮৫৯)-ও একই কথা বলেন।

কিন্তু তেমন কোনো ব্যবস্থা না করেই এদেশে ১৮২৪ থেকে ইউরোপীয়দের নীল চাষের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর থেকেই সমকালের নানা সংবাদপত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থার দ্রুত অবনতির সংবাদ পাওয়া যেতে থাকে। ১৮৪৯-এ বেথুন সাহেব জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য আইন পাস করেন এই মর্মে যে মফস্‌সলেও ইউরোপীয়দের বিচার হবে দেশীয় বিচারকদের আদালতে। কেবল মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার তাদের থাকবে না।

এদেশের ইউরোপীয়রা এই আইন এবং সঙ্গের তিনটি খসড়া আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করে। তারা আইনগুলির নাম দেয় ব্ল্যাক অ্যাক্টস। রামগোপাল ঘোষ এ আইন প্রবলভাবে সমর্থন করেন। কারণ এর ফলে পল্লী অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচার হয়তো কমবে। কারণ স্থানীয় আদালতে তাদের অপরাধের বিচার সম্ভব হবে। এজন্য হর্টিকালচারাল সোসাইটি-র সদস্য বন্ধুস্থানীয় ইংরেজগণ তাঁকে অপমান করে আর দেশের লোক এ অপমানকে নিজেদের অপমান হিসেবে গ্রহণ করে।

ইউরোপীয়দের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতার ফলে ব্ল্যাক অ্যাক্টস প্রবর্তিত হয় না। তবে এদেশের মানুষ বুঝে নেয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি। ১৮৫১-তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন তারই ফল। এর সভাপতি ধর্মসভার নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব আর সম্পাদক ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাদ্রিদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপকতা হিন্দু ও ব্রাহ্মদের এই সহযোগিতার একটি কারণ। দেবেন্দ্রনাথ কলকাতার সম্ভ্রান্ত মানুষদের একত্র করে স্থাপন করেন একটি মহাসভা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ গুণী ব্যক্তি। মহাসভার উদ্যোগে স্থাপিত হয় অবৈতনিক হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। উদ্দেশ্য হিন্দু বালকদের ইংরেজি শেখার জন্য পাদ্রি স্থাপিত বিদ্যালয়ে গমন রহিত করা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। অবশ্য আপদ্ধর্মের ফলে এই হিন্দু-ব্রাহ্ম মিলন থেকে তেমন কোনো শুভফল পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ 'সিপাহি বিদ্রোহ' (১৮৫৭) 'নীল বিদ্রোহ' (১৮৫৮-৬০), কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজের বিবর্তন, জাতীয়তাবোধের ক্রমোন্মেষ ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের সম্পর্কে বলেছেন; তবে মুখ্য স্থান কেশবচন্দ্র সেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেন। কিন্তু বাংলা দেশ বিশেষত কলকাতায় এ বিদ্রোহের কোনো প্রভাব পড়েনি, উপরন্তু এ বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুটা বিরূপতা লক্ষিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) বলেছিলেন এ বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ অনুগত প্রজাদের যোগ নেই; এটি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহিদিগের কর্মমাত্র।'—এই ছিল সে যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির মত। তাই বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তিও এ বিদ্রোহ সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিলেন।

অনেকে বলেন এর কারণ ইংরেজ আস্থাভাজন শিক্ষিত বাঙালির স্বার্থচিন্তা। এ মত ভ্রান্ত, কারণ তখন বাঙালির সৃষ্টিশক্তি ব্যাপক ও সক্রিয় ছিল। ইউরোপ আর ইংরেজের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়-জনিত সংশয়-সমালোচনাহীন গভীর শ্রদ্ধা থেকে জাত এই সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সংকীর্ণতার যোগ থাকা অসম্ভব।

১৮৫৮-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে আলোড়িত করেছিল। অনেকে সমর্থন করেছিলেন এ বিদ্রোহ। নীলকর সাহেবদের নৃশংস অত্যাচার-পীড়িত যশোর, নদিয়া, ফরিদপুর অঞ্চলের চাষিরা এ বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের প্রবলতাহেতু ব্রিটিশ সরকার নীল কমিশন নিযুক্ত করেন। কিন্তু কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের নীলবিরোধী সাক্ষ্য সত্ত্বেও সরকার প্রতিকারে ততটা সক্রিয় হননি।

নীল বিদ্রোহের অমৃতফল দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীল-দর্পণ' নাটক। নীলকরদের ঔদ্ধত্য, স্থূল প্রকৃতি, পাশবিক অত্যাচার, নীলকর-কর্মচারীদের দাস মনোভাব, চাষি তোরাপের বলিষ্ঠ সাহসী প্রতিবাদ-সমন্বিত এই নাটক প্রকাশের প্রায় সমকালেই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। নাটকটি সারা দেশকে আলোড়িত করেছিল।

অনেকের মতে এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মধুসূদন। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে এ নাটক প্রকাশ করেন পাদ্রি লঙ সাহেব। নীলকরদের অভিযোগ লঙ-এর ছ-মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা

দেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কলকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'সহ মফস্‌সলের অনেক সংবাদপত্র নীলকরদের বিপক্ষে নীলচাষিদের সমর্থন করেন। এ প্রতিবাদ প্রমাণ করে বাঙালির ইংরেজ ও ইউরোপ-প্রীতি ছিল সুন্দর ও মহতের প্রতি শ্রদ্ধা—হীন স্তাবকতা নয়।

ব্ল্যাক অ্যাক্টস, সিপাহি বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল ইউরোপীয়গণ এদেশে নিজেদের অন্যায় অধিকার সংকুচিত করতে চায় না। তার ফলে বাঙালিদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তারই সঙ্গে নাটক ও কাব্যের নতুন রূপ দেখা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। 'নীল-দর্পণ' প্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা নাটকে লক্ষিত হয় দুটি ধারা। সমাজসংস্কারমূলক বাংলা নাটক রচনা এবং সংস্কৃত নাটকের অভিনয় ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। প্রথম ধারার বিশিষ্ট নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (রচনা ১৮৫৪, প্রথম অভিনয় ১৮৫৯)। 'নীল-দর্পণ' এ ধারারই নাটক।

সংস্কৃত নাটকের পুনরভিনয়ের ধারায় আবিষ্কৃত হয় মধুসূদনের বাংলা রচনা-নৈপুণ্য। নাটকের সঙ্গে তিনি বাংলা কাব্যক্ষেত্রেও নতুন ধারার সূচনা করেন যা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-বিকাশের সূচক।

কৈশোরেই আপন কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সচেতন মধুসূদন (মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ১৮২৪-১৮৭৩) ইংরেজিতে কবিতা ও কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্য তাঁর মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু বিদেশি ভাষায় কাব্যরচনা তাঁকে তৃপ্ত করেনি। আশ্চর্যভাবে তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় পান আপন কৃতিত্বের সন্ধান। মাত্র কয়েক বছরের সাধনায় তিনি পুষ্ট করেন বাংলা সাহিত্যকে। বিশ্বসাহিত্যের ছন্দ ও ভাব তিনি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চার করেন এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় তথা বাংলার কাব্য-জগতের মধ্যে স্থাপন করেন প্রেমের যোগ। বিস্ময় ও আনন্দের বস্তুকে তিনি করে তোলেন ঘরের বস্তু।

বাঙালির মানসিক সংকীর্ণতা স্বীয় বিশ্বমৈত্রীর সাধনা নিয়ে দূর করেছিলেন রামমোহন। মধুসূদন বাঙালিকে দিলেন ভয়হীন আনন্দ আর আত্মবিশ্বাসের সন্ধান। বাঙালি হয়ে উঠল বিশ্বসাহিত্যের উপভোক্তা।

মধুসূদন ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ দেশপ্রেমকে বাংলা সাহিত্যের বিষয় করে তুললেন। অবশ্য এর সূচনা হয়েছিল কর্নেল টড-এর 'অ্যানালস অব রাজস্থান' দ্বারা অনুপ্রাণিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) ভাবশিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) রচনায়। মধুসূদনের রচনায় দেশপ্রীতি তৎকালীন বাঙালি মনে আনল জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা; কাব্য ও নাটকে দেখা দিল অস্পষ্ট হিন্দু জাতীয়তাবোধ, স্বদেশগৌরব অনুভবের চেতনা। হিন্দু জাতির পুনরুত্থান ভাবনার মধ্য দিয়ে মানবমহিমাবোধ যুক্ত হল জাতীয়তাবোধের সঙ্গে।

এ সময়েই আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) অভ্যুদয়। যৌবনেই তাঁর মধ্যে ধর্মচেতনার সূক্ষ্ম গভীর প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর নানা বক্তৃতা, উপদেশসমূহ, বিশেষ করে তাঁর 'জীবন-বেদ'-এ আছে এর পরিচয়। এ গ্রন্থে তিনি প্রার্থনাদ্বারা লব্ধ হৃদয়ের বাণীকেই একমাত্র অবলম্বন বলেছেন। তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থ, প্রতিষ্ঠান বা গুরু—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। তারপরে তিনি বলেছেন অনুভূত পাপবোধের কথা।

তৃতীয়ত বিবেকের আলোয় তিনি অন্তরের জড়তা, দৌর্বল্য, আসক্তি—এই ত্রুটিসমূহ অনুভব করেছেন এবং জেনেছেন ইচ্ছাই পাপের মূল।

ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, অপরাধ মানবজীবনের অনিবার্য অংশ আর এ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ চেতনাই জীবনোৎকর্ষের উৎস। জাতির জীবনে প্রখর নৈতিক চেতনার অভাবে পতন হয় সভ্যতার। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে প্রখর নৈতিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন তিনি। এজন্যই দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের পাশে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর স্থান।

মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই কেশবচন্দ্র ঈশ্বর, প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা, পাপবোধ, প্রত্যাদেশ, ধর্মজীবন ও প্রাত্যহিক জীবন, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ভারত ও ইউরোপের সম্পর্ক, পৃথিবীর নানা ধর্মের মূল্য ও সম্ভাবনা—এই সব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপরিণত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। এর সঙ্গে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সাধনালব্ধ ভাবসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে আসেন কেশবচন্দ্র।

তাঁর সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা আছে তাদের একটি তাঁর মধ্যে খ্রিস্টীয় ধর্ম ও সাধনার প্রভাব আধিক্য। ধারণাটি আংশিক সত্য। প্রত্যাদেশ, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে ধারণা—সবই ছিল তাঁর নিজস্ব অনুভব। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে উপদেশকালে তিনি বেদ ও বাইবেলের চেয়ে জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে বড়ো স্থান দিয়েছেন এবং স্বচ্ছ পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করে সত্যকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

কেশবচন্দ্র একই সঙ্গে ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ, অসাধারণ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংস্কারক, জাতীয় জীবনের শক্তিমান সংগঠক এবং সুনিপুণ ভাষাশিল্পী। পরিণত চিন্তার অধিকারী কেশবচন্দ্রের কর্মও ছিল পরিণত। তাঁকে সহকারী হিসেবে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়ে কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদে স্থাপন করেন। এর আগে কোনো অব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হননি।

এর মধ্যে যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। অক্ষয়কুমার জগৎচালক মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। সে বিশ্বাস তাঁকে জ্ঞানান্বেষণ ও সৎকর্মের প্রেরণা দিয়েছিল। ভক্তিধর্মমতানুসারে তিনি ঈশ্বরকে প্রেমময় জেনে তাঁর সান্নিধ্যের জন্য আকুল হননি। তাঁর মতে জগৎ নিয়মশাসিত, প্রার্থনা বা ভক্তিতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তাঁর যুক্তি সম্পর্কিত ধারণা স্মরণীয় একটি সমীকরণের রূপ নিয়েছিল—

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা = ০

দেবেন্দ্রনাথের কাছে ভক্তিই ছিল বড়ো। অক্ষয়কুমারের কঠোর যুক্তিবাদ তিনি মেনে নিতে পারেননি। আবার ভ্রাতাগণ বাৎসরিক দুর্গাপূজা বজায় রাখায় পরিবারেও ছিল অশান্তি। এ অবস্থায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সে স্থানে একাগ্র ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা তিনি পেলেন শান্তি ও শক্তি; আত্মজীবনী 'আত্মচরিত'-এ আছে তার পরিচয়। শেষে অন্তর-লব্ধ নির্দেশে ১৮৫৮-তে তিনি ফিরে এলেন লোকালয়ে। তার আগের বছর কেশবচন্দ্র যোগ দিয়েছেন ব্রাহ্ম সমাজে। হিমালয়ে প্রাপ্ত ঈশ্বর-চেতনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়ে উঠল নতুন শক্তির উৎস। কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে এল গতি। উভয়ের যৌথ প্রয়াসে ব্রাহ্ম সমাজ হয়ে উঠল শক্তিমান। এই ব্রাহ্ম সমাজের কাছে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি লাভ করলেন জীবন ও কর্মের নবরূপ ও তাৎপর্য। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব বাংলার নব জাগরণে স্মরণীয়; কারণ তাঁরা শুধু পারত্রিক বিষয়েই মগ্ন ছিলেন না; জাগতিক সমস্যার সমাধানেও তাঁরা ছিলেন সম-মনোযোগী। তার প্রমাণ ১৮৬০-এ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ভিক্ষ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্য।

ভগবৎপ্রীতি যখন মানুষকে পরার্থপর, মানুষের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন করে তোলে তখন সমাজ ও সভ্যতা হয়ে ওঠে কল্যাণ ও শান্তির উৎস। কারণ যারা কাজ করে আর যাদের জন্য কাজ করা হয়—উভয় পক্ষই আত্মিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দেহের ক্ষুধা মানুষের একমাত্র ক্ষুধা নয়। কিন্তু তার আত্মিক ক্ষুধা প্রায়শ সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকায় সক্রিয় হয় না। ধর্মের কল্যাণময় আত্মিক বা নৈতিক দিক এবং তার সংস্কারময় অন্ধ আচারের দিক—উভয়

দিক সম্বন্ধে নব জাগরণ যুগের মনীষীরা ছিলেন সচেতন। এখানেই এ যুগের ধর্মসাধনার বিশেষত্ব।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র—দু-জনেরই মধ্যে ছিল সমাজকল্যাণমূলক ভগবৎ-প্রেম। কেশবচন্দ্রের মধ্যে সমাজ কল্যাণের মনোভাব ছিল অধিক। ব্রাহ্ম সমাজকে তিনি সর্ব দুর্বলতাশূন্য আদর্শ ধর্ম সমাজ রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ডিরোজিয়ো-পন্থীদের সমালোচনা এবং নিজস্ব অধ্যাত্ম অনুভব তাঁকে এ কর্মে প্রাণিত করেছিল।

প্রচারক জীবনের শুরু থেকেই কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মালোচনা ও বিচিত্র কর্মের সহায়ক একদল যুবক অনুরাগী লাভ করেন। এঁরা বিধবাবিবাহ, উপবীত-ত্যাগ প্রভৃতি সংস্কারমূলক কর্ম আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করে তাঁদের প্রয়াসের যথার্থতা স্বীকার করেন। ব্রাহ্ম সমাজ কিন্তু সমাজসংস্কার সম্পর্কে তত আগ্রহী ছিল না। তারা ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজের অংশ মনে করত এবং হিন্দু সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তাদের কাম্য ছিল। এজন্য সংস্কারের গতি মন্থর করতেও তাদের আপত্তি ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীন ও নবীন—উভয় দলের প্রতিই প্রীতি ছিল। কিন্তু অগ্রসর দল যখন উপবীতধারীদের বেদীতে বসা বন্ধ করতে চাইল এ অজুহাতে যে তাঁরা যথার্থ ব্রাহ্ম নন তখন দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন দলের সমর্থন করলেন। কারণ উপবীতধারীদের মধ্যেও আছেন অনেক প্রকৃত ত্যাগী ব্রাহ্ম—যাঁরা দীর্ঘকাল ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের সেবা করছেন। নতুন ব্যবস্থায় তাঁরা অপমান বোধ করবেন। তরুণ দল কিন্তু নীতি ও আচরণের ব্যবধান মেনে নেওয়া অন্যায় মনে করতেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে বেশ কিছু পত্রবিনিময় হয়। উভয়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও দুজনেই স্ব স্ব নীতিতে অবিচল রইলেন। ফলে ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হল। ১৮৬৫-তে কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ', দেবেন্দ্রনাথ অনুবর্তীদের নাম হল 'কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ', এ দল অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ল। এই বিভাগ সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে প্রীতি-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকল।

ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিকাশমূলক ধর্মের প্রয়োজন। এই বিকাশভিত্তিক ধর্ম দেবেন্দ্র-অনুগামী তথা মন্থরগতি ব্রাহ্মদের কাছে পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি তাঁরা হতে চেয়েছিলেন ভব্য হিন্দু। যুগের দাবি না মেটাতে পারায় তাঁরা পিছিয়ে পড়লেন।

কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্ম সমাজকে ত্রুটিমুক্ত আদর্শ ধর্মসমাজ করে তোলার চেষ্টা করলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই অগ্রসর-প্রবণতা অভিনন্দিত হল সারা ভারতে। এরূপ অগ্রগামিতা কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ধীরে ধীরে দেশের সর্বত্র মূর্ত হয়ে উঠল। এই সংস্কারমুক্ত সবলচরিত্র ব্রাহ্মগণ লাভ করল ডিরোজিয়ো-পন্থী রামতনু লাহিড়ীর অভিনন্দন।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে সমাজ-কল্যাণকামনার সঙ্গে ছিল প্রবল ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরপ্রীতির একটি রূপ অনড় সংস্কার-অনুবর্তী স্বয়ংসম্পূর্ণতার বোধ। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের একাংশের মধ্যে দেখা গেল এই আত্মকেন্দ্রিক ভগবৎ-প্রীতি। তাঁদের মধ্যে দেখা দিল বৈষ্ণবদের মতো কীর্তনাসক্তি, প্রাচীন খ্রিস্টানদের মতো প্রবল পাপবোধ এবং পরস্পরের বিশেষত কেশবচন্দ্রের পদ স্পর্শ করে পাপের মার্জনা ভিক্ষার প্রবণতা। এই খ্রিস্ট-অনুরক্তি ও নরপূজা-প্রবণতা দেশবাসীদের মনে বিরূপতার সৃষ্টি করল।

এ সময়েই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ'-এ একটি নতুন দল গড়ে উঠল। এঁরা পূর্বের মতো কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। পুরোনো দলের ব্রাহ্মদের মধ্যেও কেশবচন্দ্র আর তাঁর অনুগামীদের ভক্তি-অতিরেক সমালোচিত হল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের মাঘোৎসবের ভাষণে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টানুরাগ ও অবতার-অনুগামিতা—দুই প্রবণতা বিষয়ে সাবধান করে দিলেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের একাংশের মধ্যে ভাবানুরাগের আতিশয্য দেখা দিয়েছিল—একথা সত্য। কিন্তু কেশবচন্দ্রের খ্রিস্ট-অনুরাগকে দেবেন্দ্রনাথ ঠিকমতো না বুঝেই আক্রমণ করেন। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্ম ধর্মকে যে কোনো সাম্প্রদায়িক পৌত্তলিক ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু বাস্তবে এই খ্রিস্ট-বিমুখতা সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয়দাতা হয়ে দাঁড়াল।

এর পূর্বে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড যান। সেখানে তিনি খ্রিস্ট-এর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ভিন্ন ধর্মের উদার ব্যাখ্যা দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মৈত্রীকে অভিনন্দিতও করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ইংরেজ সরকারের ভারত-শাসননীতির মধ্যস্থিত অবিচার, দমননীতি ও অত্যাচারেরও অকপট সমালোচনা করেন। তৎকালের শিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙালি উভয়েরই গৌরবের কারণ এই ঘটনা। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর কেশবচন্দ্রের দেশপ্রেম আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি দেশসেবার জন্য সুলভ সাহিত্য প্রচার, নারী উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার, সুরাপান বর্জন ও জনসেবার আদর্শ গ্রহণ করেন। ইংরেজ পরিবারের মতো ব্রাহ্ম পরিবারেও তিনি আনতে চেয়েছিলেন শৃঙ্খলা আর শ্রী।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে পাস হয় ধর্মনিরপেক্ষ বিবাহবিধি। পূর্বে ডিরোজিয়ো-শিষ্যগণ এরূপ আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস কেশবচন্দ্রের অ-হিন্দু মানসিকতার প্রকাশ বলে তীব্রভাবে সমালোচিত হয় হিন্দু ও পুরোনো ব্রাহ্ম সমাজে। কারণ কেশবচন্দ্র এ বিষয়ে ঘোষণা করেন 'The term of Hundu does not include the Brahmo' (ব্রাহ্ম হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত নয়)। এক দিক দিয়ে উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন ব্রাহ্ম ধর্ম হয়ে উঠবে বিশেষ এক বিশ্বশক্তি। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'ঋষিদের সমাগম' ভাষণে তিনি প্রার্থনা করেন বাংলা দেশ হবে পুতুলপূজামুক্ত ব্রহ্ম দেশ। কাজেই তিনি যদি ব্রাহ্মদের হিন্দু না মনে করেন তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশ্বে প্রচলিত ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের মহত্তর পরিণতি ছিল তাঁর কাম্য। তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক সংঘবদ্ধ প্রাগ্রসর দল, কোনো নতুন ধর্মের প্রচলন তাঁর কাম্য ছিল না। কিন্তু তাঁর এ উক্তিকে ভিত্তি করে তাঁকে আক্রমণ করে পুরোনো ব্রাহ্ম গোষ্ঠী। এ দলের অন্যতম পরিচালক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধ। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তাঁর মতে এ ধর্মের মধ্যে উচ্চাধিকারীদের জন্য নিরাকার উপাসনা ও নিম্নাধিকারীদের জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে। অতএব কেশবচন্দ্রের দলের এ ধর্মের সংস্কার-প্রয়াস তাঁদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রবন্ধটি অতি জনপ্রিয় হয় এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সহায়ক হয়। যদিও পরিবর্তনবিরোধী এবং স্বজাতির গৌরবকীর্তনমূলক লেখাটির একমাত্র মূল্য হিন্দুদের আত্মসম্মানবোধের পুষ্টিসাধন।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে ছিল অসাম্প্রদায়িক কর্মোদ্যম এবং ভক্তি ও বৈরাগ্য-তন্ময়তা। জীবনের শেষ দিকে তাঁর মধ্যে এই মরমিভাবটিই প্রবল হয়। ১৮৭৫-এ তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। অনেকের মতে এর ফলে কেশবচন্দ্রের মরমি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রামকৃষ্ণদেবের কিছুটা প্রভাব থাকলেও এ প্রবণতা ছিল কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিগত। তবে তিনি কোনো সময় আপন প্রখর নীতিচেতনা থেকে সরে যাননি। তাঁর 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' পড়লে বোঝা যায় তিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন কর্মোদ্যম।

জীবনের শেষভাগে টাউন হল-এ কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের কয়েকটিতে খ্রিস্টপ্রীতির আধিক্য ছিল। তা থেকে তাঁর সাধনাকে খ্রিস্টীয় সাধনা মনে করা সম্ভব। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্মমত খ্রিস্টপ্রীতি সত্ত্বেও ছিল স্বতন্ত্র। খ্রিস্ট-এর নৈতিক চেতনা ও নৈতিক দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দান রামমোহনের মতো কেশবচন্দ্রকেও মুগ্ধ করেছিল। শেষ জীবনে কেশবচন্দ্রের এই আত্মিকচেতনায় তাত্ত্বিকতা প্রবল হয়। তিনি এসময় কর্মোদ্যম ও মরমি সাধনার সামঞ্জস্য সাধনে সমর্থ হননি। তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ এসময় ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম ও সাধনা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেন। তবে শেষ জীবনে কেশবচন্দ্রের সাধনার রূপ বাংলার নব জাগরণের ক্ষতি-ই করে। তাঁর মূল্যবান দান

'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ', 'সাধু-সমাগম', 'জীবনবেদ' এই তিন গ্রন্থ এবং ইংরেজি বক্তৃতাবলির প্রভাব সমকালে দেশের উপর পড়েনি। বরং এসবের প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তার অন্ধ আবেগই বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন বাঙালির নবজাগ্রত শক্তি সফলতার পথের অভাবে হয়ে উঠেছিল বিক্ষুব্ধ। এই পরিস্থিতিতে কেশবচন্দ্রের অন্তর্জীবন গঠনের উপদেশাবলি, তত্ত্বচিন্তা আর বিচিত্র ভাবকল্পনা অপ্রয়োজনীয়বোধে ত্যক্ত হয়েছিল। দেশের জাগ্রত চেতনার সঙ্গে তখন ইংরেজশাসকের অহমিকার বলপরীক্ষা শুরু হয়েছে। সে সময় কেশবচন্দ্র ইংরেজশাসকদের বশ্যতা স্বীকারের কথা বলেন; কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল কুসংস্কারজীর্ণ আশাহীন এ দেশের উন্নতির জন্য ঈশ্বর তাদের পাঠিয়েছেন। ইংরেজ-আনুগত্য দ্বারাই এদেশের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্ভব হবে। এ কথাগুলি বুঝিয়ে দেয় দেশের চিত্তের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ ছিন্ন হয়েছে। ইংরেজশাসন এদেশের পক্ষে নানাভাবে শুভকর হয়েছে—কেশবচন্দ্রের এই মত নিছক ভাববিলাস নয়। কিন্তু দেশ তখন চেয়েছিল তার জাগ্রত চেতনার বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসকের বাধার প্রতিকার। এক্ষেত্রে নেতা কেশবচন্দ্রের উপযুক্ত সহায়তা না পাওয়ায় দেশবাসী তাঁর নেতৃত্ব, উপদেশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আস্থা হারায়।

কেশবচন্দ্রের মরমি প্রবণতার আধিক্যে তাঁর অনুবর্তীদের একটি দল ক্ষুব্ধ হন। এঁরা দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সফলতাকে ধর্মীয় সফলতার মতোই মূল্যবান মনে করতেন। কেশবচন্দ্র তখন বলছিলেন তিনি অন্তরলব্ধ ঈশ্বরাদেশের দ্বারা চালিত হন, বাইরের মতামতের দ্বারা নন। তাঁর আর এক মত ছিল ব্রাহ্ম প্রচারকরা ঈশ্বরের অধীন ব্রাহ্ম মণ্ডলীর নন। এসব কারণে নবীন দল অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হল কেশবচন্দ্র ক্রমে প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে উঠছেন। এ মতভেদ চরমে উঠল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে—উপলক্ষ্য কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের চোদ্দো বছরের কন্যার বিবাহ। কারণ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের আগ্রহে প্রবর্তিত নতুন আইনে কন্যার বিবাহ-বৎসর নির্দিষ্ট হয়েছিল ষোলো। পরিণামে ব্রাহ্ম সমাজ আবার বিভক্ত হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ কেশব-বিরোধী দলের নাম হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঠন করলেন 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ'। মন্থরগতি ব্রাহ্ম সমাজের এতদিনের নাম 'কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ' পালটে হল 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ'।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বিরোধকালে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি নষ্ট হয়নি। কিন্তু এবার দু পক্ষের মধ্যে অধিক তিক্ততা সৃষ্টি হল। এ ব্যাপারে কোন পক্ষ দায়ী তা নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ তিনি ছিলেন নেতা; নেতার দায়িত্ব অনেক বেশি। একটি দল গঠনের পরও তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলেন। সে অধিকার তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর স্বার্থপরতাই যেন প্রকট হয়েছিল।

দলভঙ্গের পর কেশবচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। কেউ কেউ বলেন 'নব বিধান ব্রাহ্মসমাজ' উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতম রূপ। কেশবচন্দ্র নিজেও তাই মনে করতেন। এক দিক থেকে একথা সত্য। এ প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্ম সভ্যতা-সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের প্রতি যে শ্রদ্ধা-প্রীতির মনোভাব ছিল তা উনিশ শতকের বাংলার রেনেশাঁস-এর মূর্ত রূপ। আধুনিক জগতে বিভিন্ন দেশের নানা মতের লোক নিকটস্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব বিশেষ মূল্যবান। এই শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক মানুষে মানুষে যোগসাধনের অন্যতম পথ। অবশ্য সঙ্গে চাই বহু সৃষ্টিমূলক চিন্তা ও কর্মায়োজন। বিশেষ করে ভারতের মতো ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জাতির দেশে পারস্পরিক অকপট শ্রদ্ধা-প্রীতির মনোভাবের গুরুত্ব সঠিক।

এই মূল্যবান চিন্তার সঙ্গে 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ'-এর ছিল একটি শিথিল চিন্তা—সব ধর্মের সত্যতা স্বীকার। কারণ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বর্তমান নানা অসত্য ও অসার্থক চিন্তা। আবার সত্যের বিচিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে অনেক ধর্মে। সেই সব প্রকাশবৈচিত্র্যের উপলব্ধি ভিন্ন সত্যের সম্যক বোধ সম্ভব নয়—কেশবচন্দ্রের এ মতও সত্য। কিন্তু

সত্যের অতীত প্রকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে সত্যের নব নব প্রকাশ সম্পর্কে সচেতনতা কমবে; ফলে মানুষের অসার্থকতার সম্ভাবনা বাড়বে। কারণ বর্তমানে ন্যায় ও যুক্তির নিয়মে করণীয় কী—এটাই মানুষের বড়ো প্রশ্ন। অস্পষ্ট অতীতকে গুরুত্ব দিলে এ প্রশ্নের উত্তর দানের যোগ্যতা হ্রাসের সম্ভাবনা অধিক। কোনো ধর্ম স্থির নয়, সময়ের সঙ্গে তাদের বিচিত্র রূপ ও প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই সব কারণে সব ধর্ম সত্য—এই শিথিল চিন্তার চেয়ে বিভিন্ন ধর্ম বা জীবনাদর্শ কীভাবে ত্রুটিমুক্ত হয়ে বর্তমানে মানুষের কাছে লাগবে, তাকে নতুন করে উদ্বোধিত করবে সে ভাবনাই যথার্থ।

কেশবচন্দ্র যখন সমকালের স্বদেশের মানুষের অনুন্নত জীবনের বেদনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সকলকে কুসংস্কারমুক্ত প্রখর নৈতিক দায়িত্বযুক্ত উন্নত জীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন তখন তিনি বহু জীবনকে আনন্দময় করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাত্ত্বিকতা বা মরমী চিন্তাকে প্রাধান্য দিলেন তখন তাঁর অন্তরঙ্গ অল্প কয়েকজনই আনন্দ লাভ করেছিল। তাঁর নিজের আনন্দও কমই ছিল। চার পাশের বহু মানুষকে যা সার্থকতার সন্ধান বা প্রেরণা দিতে পারে না বা চায় না সে সত্যের মূল্য তর্কাতীত নয়। বর্তমানে অনেক মানুষকে প্রাণিত করতে পারে বহুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত সত্য—এবং তার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। অতীতের ধর্মমত বা সাধনরীতি তৎকালে সত্য বর্তমানে তার প্রেরণাদানের শক্তি নেই।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ' স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ জগতের বহু প্রাচীন বিধানের মত ও পক্ষের সম্মিলন এ সমাজের প্রয়াসে হয়েছিল এবং তারই ফলে গড়ে উঠেছিল একটি নতুন বিধান। কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা বাস্তবে 'নব বিধান ব্রাহ্মসমাজ' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল—এ স্বীকৃতি দেবেন্দ্রনাথ এমনকি পরে রবীন্দ্রনাথও দিয়েছেন।

আবার চেতনার প্রাখর্য ও ভাষাব্যবহার-দক্ষতার বিচারে বাংলার রেনেসাঁস-ইতিহাসে কেশবচন্দ্র স্মরণীয় একটি নাম।

রেনেসাঁস যুগে বাংলার নাটক ও কাব্যসাহিত্যে দেখা দিয়েছিল নতুন রূপ—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ক্রমে এই নবীনতা সঞ্চারিত হল কথাসাহিত্যে। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিত হয় এই নাটক-কাব্যের যুগেই। সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্ব থাকলেও সাধারণ মানুষকে সমকালে উপন্যাসটি আকর্ষণ করতে পারেনি। শিক্ষিত সাধারণ বাঙালির চিত্ত-আকর্ষক প্রথম বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। সংস্কৃতজ্ঞ আর ইংরেজিনবিশ—উভয় সমাজেই উপন্যাসটি আদৃত হয়। পরের উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। প্রকাশের পর শিক্ষিত সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতি দৃঢ় হল। ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বাড়ল এবং তিনি লাভ করলেন চিন্তানায়কের সম্মান।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন মূলত দু'ভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে তিনি প্রধানত শিল্পী, গৌণত দেশপ্রেমিক। দ্বিতীয় ভাগে তিনি মুখ্যত দেশভক্ত, পরে শিল্পী। দ্বিতীয় ভাগে নিজেকে জাতির শিক্ষকরূপে পরিচিত করায় শিল্প হিসেবে তাঁর রচনা হয়েছে কিছু হীন। এ স্তরের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪)। চরিত্রচিত্রণ শক্তি ও ভাষার ব্যঞ্জনাসৃষ্টি-দক্ষতা এ উপন্যাসে আছে। তবে এখানে তিনি নিজেকে প্রচারক করে তুলেছেন এবং প্রচারের বিষয়ও তেমন উন্নত নয়—ফলে শিল্পসৃষ্টি ততটা সার্থক হয়নি। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজে তাঁর এই রূপই প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলা ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ইংরেজিনবিশ হিসেবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নায়ক-নায়িকা চরিত্র-পরিকল্পনায় ইউরোপীয় সাহিত্য বিশেষত শেকসপিয়র-এর প্রভাব প্রবল। অবশ্য শেকসপিয়র-এর

মতো কল্পনা-ব্যাপ্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নেই। তথাপি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণে তিনি প্রায়শ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ দ্বন্দ্ব অবশ্য প্রধানত প্রেমকেন্দ্রিক।

ততটা সবল, উদ্দাম কল্পনা না থাকলেও দ্বেষ-ক্রোধচালিত প্রাত্যহিক মানব-জীবনের রূপদানে তিনি মধুসূদনেরই অনুবর্তী ('বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'সনেট') এবং অধিক অগ্রসর। কারণ তাঁর চরিত্রসমূহ সাধারণ মানুষ; পুরাণখ্যাত দেবচরিত্র নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাংলা দেশে সমাজ ও ধর্মের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন প্রয়াস চলেছিল। সম্ভবত কালের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এদিকে আকৃষ্ট হন। এক্ষেত্রে সমকালের ব্রাহ্ম নেতাদের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পড়েছিল অথবা বলা যায় এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য ছিল। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের এক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র জীবনের ও মানুষের সার্বিক উন্নতির কথা বলেছিলেন। মনের ও দেহের যাবতীয় বৃত্তির সম্যক অনুশীলন দ্বারা সেরূপ উন্নতি সম্ভব—এটাই ছিল তাঁর মত। তিনি আরও বলেছিলেন ঐশ্বরিক প্রীতিই উন্নতির যথার্থ পথ। কেশবচন্দ্র এ চিন্তার প্রেরণা পেয়েছিলেন আমেরিকা ও ইংল্যান্ড-এর চ্যানিং, পার্কার, নিউম্যান প্রমুখ একত্ববাদী খ্রিস্টান মনীষীদের কাছে। তাঁর মধ্যেই তা প্রথম সুস্পষ্ট রূপ পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত মত—মানুষের সমুদয় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনই ধর্ম—কেশবচন্দ্রের উক্ত চিন্তার প্রভাবেই জাত। দেশকে দশভুজা দুর্গারূপে কল্পনাও বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তা নয়। এ বিষয়ে তিনি সমসাময়িক নাট্যকার এবং হিন্দু মেলার অন্যতম নেতা মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) নিকট ঋণী। চিন্তাক্ষেত্রে মৌলিকতা খুবই দুর্লভ। সুতরাং চিন্তার অ-মৌলিকতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষী করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মারাত্মক দুর্বলতা সৃষ্টিধর্মী উৎকৃষ্ট চিন্তার তুলনায় হিন্দু-ঐতিহ্য-গর্বকে গুরুত্ব দেওয়া। সৃষ্টিধর্মী চিন্তা মানুষকে তার মহত্তর সম্ভাবনা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে। আর ঐতিহ্যগর্ব কিছুটা সচেতনতা দিলেও শেষ পর্যন্ত দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ণ করে বাড়িয়ে দেয় অন্ধ আবেগ। দেশ ও জাতির সংগঠকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতার বহু প্রমাণ আছে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'বঙ্গদেশের কৃষক'—এই সব বিখ্যাত রচনায়। উদাহরণরূপে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কথা বলা যায়। প্রবন্ধটিতে কৃষকদের দুঃখদুর্দশার মর্মস্পর্শী চিত্রাঙ্কনের জন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এ দুঃখ দূর করার উপায় নির্ধারণে তিনি ব্যর্থ। দশশালা বন্দোবস্ত প্রভৃতি বহু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেও জমিদারি প্রথার বিরোধিতা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। বরং এ প্রথার বিরোধিতাকে তিনি অন্যায় বলে মনে করেছেন এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর কাছে অত্যাচারী জমিদারদের সংযত করার আবেদন জানিয়েছেন।

দেশপ্রেমের মন্ত্রস্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীদের কাছে পেয়েছেন ঋষির সম্মান। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম প্রাণিত করেছিল বহু মানুষকে। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমের বড়ো ত্রুটি উগ্র জাতীয়তাবাদ, 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করলেও তাঁর কোনো কোনো রচনায় আছে তার প্রকাশ। সে কারণেই সম্ভবত দেশবাসীরা তাঁকে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্যই অভিনন্দিত করেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপ-এ এনেছে প্রলয়। আমাদের দেশেও এনেছে খণ্ড প্রলয়। আজও তার শক্তি নিস্তেজ হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সার্থক ও অসার্থক চিন্তার জটিল বন্ধন রয়েছে। সেই বন্ধন মোচন ভিন্ন একালে তাঁর চিন্তা থেকে সুফল পাওয়া যাবে না। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্ভবন জাতীয় ঐতিহ্যগর্ব—বর্তমানে এই মূল্যহীন চিন্তার বিপদ সম্ভাবনা প্রমাণিত।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ গৌরব শিল্পী হিসেবে। সেখানে মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ সহজ ও গভীর। চিন্তানায়ক হিসেবে তাঁর ত্রুটি গুরুতর। এ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকলে তাঁর দেশপ্রেম থেকে পাওয়া যাবে সুফল।

বঙ্কিম-যুগের আর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। অনুগ্র যুক্তিনিষ্ঠা প্রীতিপ্রবণ

হিন্দুত্বের প্রকাশ তাঁর রচনার বিশেষত্ব। যুক্তিনিষ্ঠার দুর্বলতা তাঁর রচনার ত্রুটি আর অন্যান্য ধর্ম ও সমাজের প্রতি দ্বেষহীনতা তাঁর রচনার গুণ।

কেশবচন্দ্রের সমকালে বাংলার নবজাগরণের এর আর এক বিশেষত্ব ইংরেজের অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্মেষ। রাজনারায়ণ বসুর মতে ১৮৬৬-তে তিনি 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপনের যে প্রস্তাব করেন তারই প্রভাবে নবগোপাল মিত্র এবং তাঁর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সহকর্মীরা ১৮৬৭-তে স্থাপন করেন 'হিন্দুমেলা'। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জাতিকে সংঘবদ্ধ ও আত্মসম্পূর্ণ করে তোলা। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল হিন্দুমেলা। এরই এক অধিবেশনে 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অনেক আগে নাট্যকার মনোমোহন বসু বলেন শারদীয় দেবীর মতো হিন্দুর জাতীয় উন্নতিও দশভুজা।

১৮৭২-এ বাংলায় নাট্যশালা হয়ে ওঠে বিশিষ্ট এক শক্তি ; তার বিশেষ কাজ হিন্দুর নব জাগ্রত জাতীয়তার বার্তা সাধারণ্যে প্রচার।

এ সময়ের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, (১৮৪৮-১৯০৯), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) আই. সি. এস. পদ প্রাপ্তি। সামান্য ত্রুটির কারণে সুরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যে অপসৃত হন। একই ত্রুটির জন্য জনৈক ইংরেজ আই. সি. এস.-কে সাসপেনশন দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথের পুনর্বিচারের সব আবেদন (ইংল্যান্ড ও ভারতে) অগ্রাহ্য হয়। ব্যারিস্টার হওয়ার সুযোগও তিনি পান না। দেশের শিক্ষিত সমাজ ব্যাপারটিকে ইংরেজ কর্তৃক শিক্ষিত বাঙালির অবদমন মনে করে। এই সময় আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমিয়ে উনিশ করা হয়। শিক্ষিত বাঙালিরা এ বয়স বাড়িয়ে বাইশ করার জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলন করে। সৃষ্টি হয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর নেতা। তাঁর বক্তৃতার ফলে ভারতের নানা প্রদেশের কয়েকটি শহরে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর শাখা স্থাপিত হয়। তবে উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁকে বাধা দেন এই বলে যে মুসলমানদের পক্ষে সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত নয়।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের মূল কারণ কিন্তু ইংরেজ শাসকের অপ্রসন্নতা ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালির আত্মপ্রকাশমূলক সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির পটভূমিতে ছিল ইংরেজশাসক কর্তৃক মফস্সলে কলেজ তুলে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও অস্ত্রব্যবহারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। ইংরেজকে বাঙালি এতকাল জেনেছিল অকৃত্রিম হিতৈষী রূপে। সে ভাবনায় এইসব আঘাতের ফলে চিড় ধরল এবং দেখা দিল বড়ো ফাটল—ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তার প্রতীক। সাহিত্য, জাতীয় সংগীত, হিন্দুমেলা, নাট্যশালা, 'বঙ্গদর্শন'—এ সবের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার যে প্রকাশ লক্ষিত হয় তারই পূর্ণ রূপ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। শিক্ষিত বাঙালির নতুন চেতনা পরিচিত ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিসেবে। এ জাতীয়তাবাদ কিন্তু ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী ছিল না। অপেক্ষাকৃত অ-সংঘবদ্ধ হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। হিন্দুদের মধ্যে আরম্ভ হলেও এর দৃষ্টি ছিল সারা দেশের প্রতি আর আত্মিক যোগ ছিল সমস্ত জগতের উন্নতিপ্রবণতার দিকে। সুরেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সারা দেশের জাগরণকে দিলেন যোগ্য রাজনৈতিক মর্যাদা। ভারত-ইতিহাসে এটি স্মরণীয় এক ঘটনা।

হিন্দু মেলা থেকে কংগ্রেসের জন্ম—এমন বলা হয়। কিন্তু একথা বলাই সংগত হিন্দুমেলা আর ধর্ম-সমাজের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক শক্তিশালী নতুন সাধনা সুরেন্দ্রনাথকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের প্রেরণা দেয়। তারই পরের ধাপ ভারতীয় কংগ্রেস।